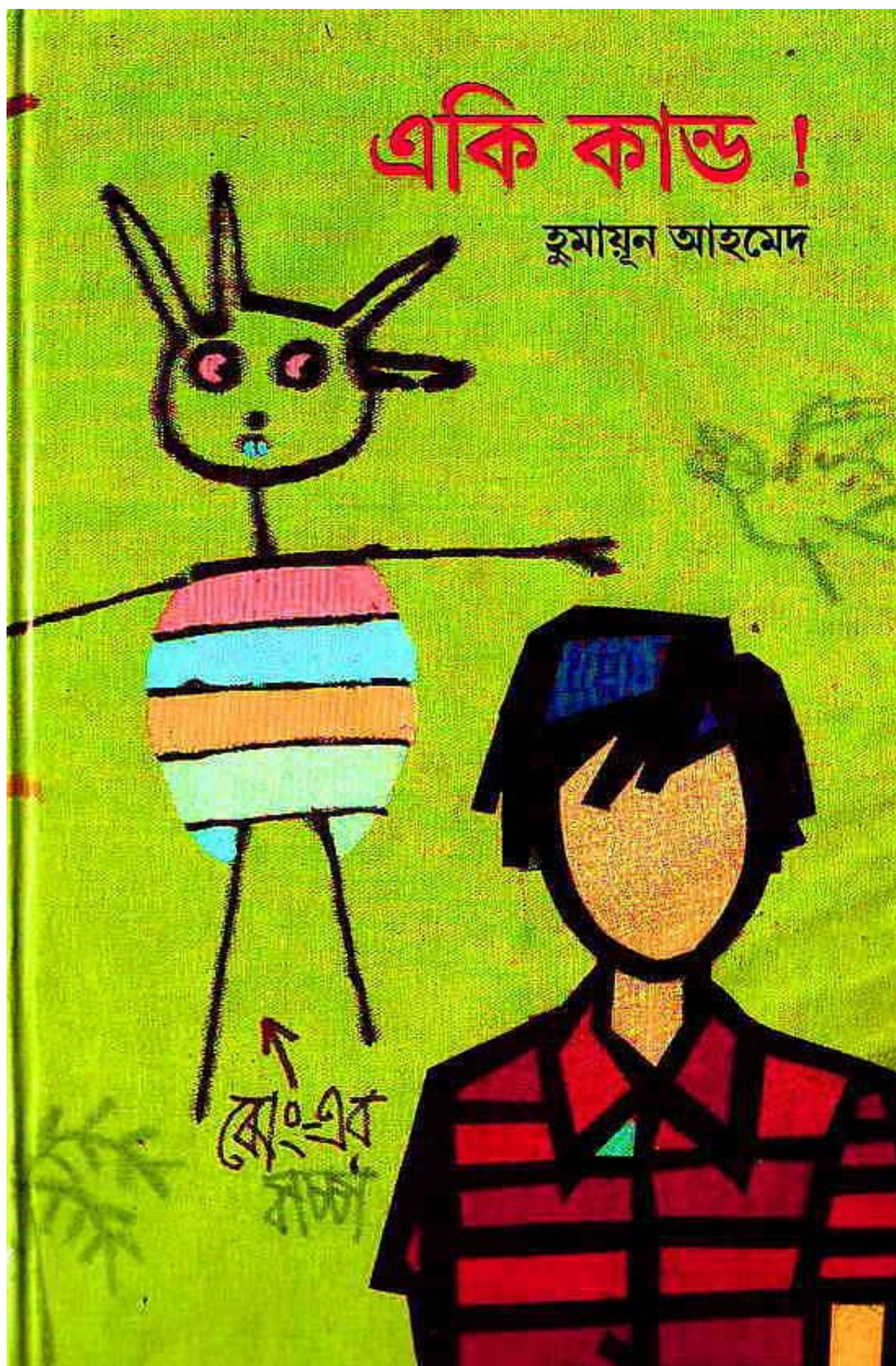

একি কান্ড !
হুমায়ূন আহমেদ

১

টুকুনের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

টুকুন কিছু বলতে গেলেই তাঁর মা চোখ বড় বড় করে বলেন, আবার? আবার? চুপ কর বললাম। কিছু শুনতে চাচ্ছি না।

টুকুন করুণ গলায় বলে, শুনতে চাচ্ছনা কেন মা?

টুকুনের মা বিরক্ত গলায় বলেন, তোমার বানানো গল্প শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে। এই জন্যেই শুনতে চাচ্ছি না।

টুকুনের বাবা এতটা নির্দয় নন। তিনি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ছেলের কথা শুনে দুঃখিত গলায় বলেন, কেন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছ?

টুকুন যদি বলে, বানিয়ে বলছি না তো বাবা। যা বলছি সবই সত্যি।

তখন তার বাবা আরো গম্ভীর হয়ে যান। থেমে থেমে বলেন, তুমি বলতে চাচ্ছ একটা কাক এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে?

'হুঁ। জানালার রেলিং-এ এসে বসে, তারপর গল্প করে।'

'কি গল্প?'

'নানান ধরনের গল্প।'

'আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমার সেই কাককে দেখিনি।'

'তোমরা যখন আশে পাশে থাক তখন তো সে আসে না।'

'সে কখন আসে?'

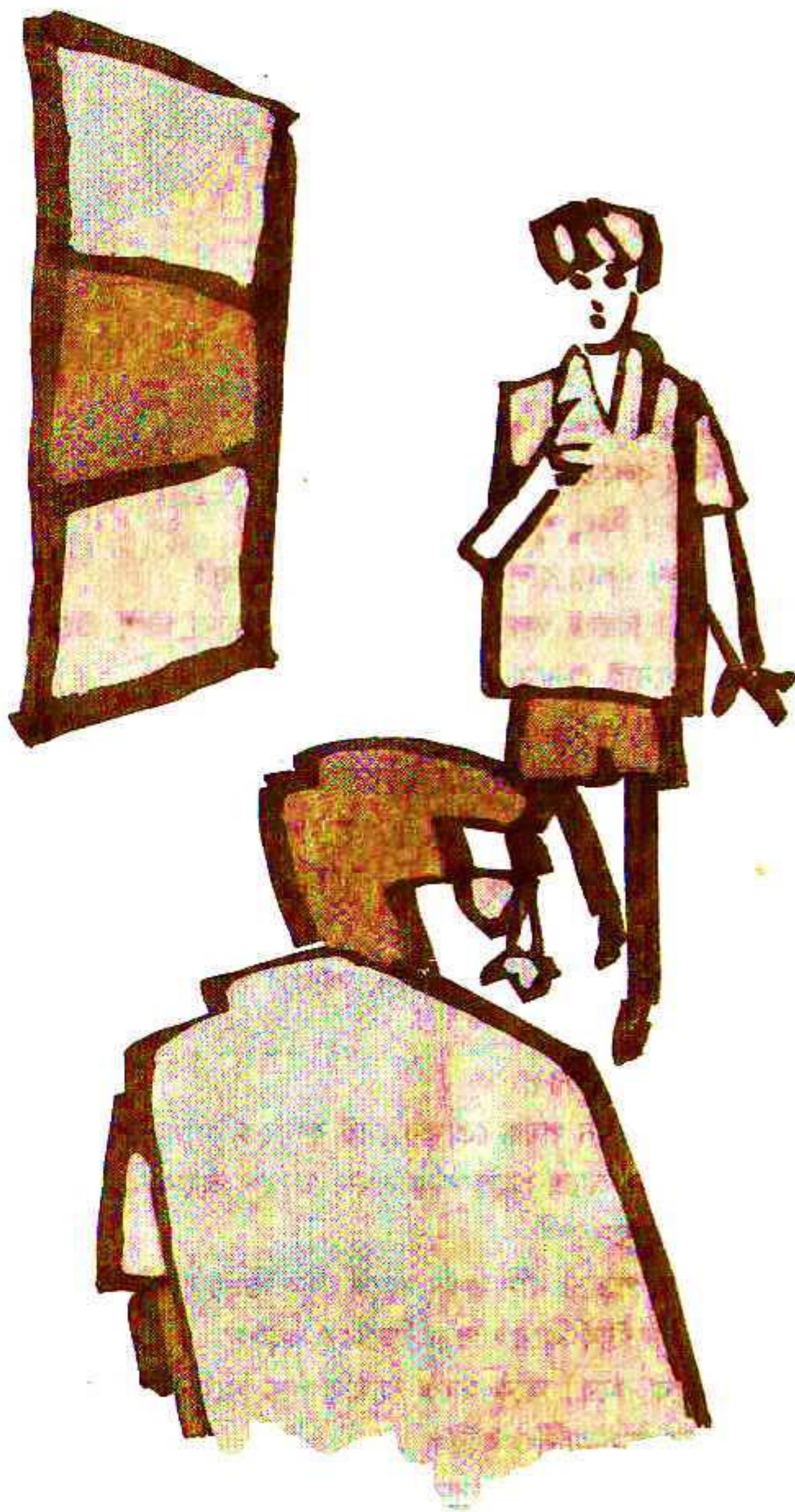
'আমি যখন পড়তে বসি তখন আসে। খুব ডিসটার্ব করে।'

'কিভাবে ডিসটার্ব করে? পড়া জিজ্ঞেস করে?'

'মাঝে মাঝে করে। মাঝে মাঝে আমার পড়া নিয়ে হাসাহাসি করে।'

'পড়া নিয়ে হাসাহাসিও করে?'

'হ্যাঁ করে। ঐদিন বলল, টুকুন ভুটানের রাজধানী যেন কি বললে?



'ভুটানের রাজধানীর নাম হওয়া উচিত কিম্পু!'

আমি বললাম, 'থিম্পু। কাকটা বলল, লজ্জাকর একটা নাম। শুরু হয়েছে থ দিয়ে। থ দিয়ে কি হয় — থু থু। ভুটানের রাজধানীর নাম হওয়া উচিত কিম্পু। কিম্পু শুরু হয় 'ক' দিয়ে। ক হচ্ছে সবচে' ভাল অক্ষর কারণ কাক শুরু 'ক' দিয়ে।'

'তোমাকে সে বলল?'

'জ্বি বাবা।'

'আচ্ছা, এখন চুপ করে আমার সামনে বস। আমি তোমাকে দু'-একটা কথা বলব। শান্ত হয়ে বস। নড়াচড়া করবে না। পেনসিলটা নিয়ে এরকম করছ কেন? খোঁচা খাবে। পেন্সিল টেবিলের উপর রাখ। পা এমনভাবে নাড়াচ্ছ কেন? তুমি তো ফুটবল খেলছ না, বসে আছ। ভদ্র হয়ে বস।'

টুকুন ভদ্র হয়ে বসল। তার বাবা রশিদ সাহেব, টুকুনের মা এবং টুকুনের ছোট বোনকে ডাকতে গেলেন। টুকুনের ছোটবোনের নাম মৃদুলা। তার বয়স দেড় বছর। দাঁড়াতে পারে। একটু একটু হাঁটতে পারে তবে এখনো কথা বলতে পারে না। টুকুন কে সে ডাকে — 'কুন'। মৃদুলা হচ্ছে সবদিক দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ে। দুধ খাওয়া নিয়ে হৈ চৈ করে না। খাব না, খাব না বলে টুকুনের মত সারা বাড়ি ছোটাছুটি করে না। মিষ্টি মুখ করে খেয়ে ফেলে, তারপর অবশ্যি ওয়াক করে বমি করে ফেলে। মৃদুলার স্কুলে যাবার দরকার নেই কিন্তু সে খুব স্কুলে যেতে চায়। টুকুনের মত স্কুলে যাবার সময় হঠাৎ মুখ কালো করে বলে না — মা, আমার হাঁটুতে ব্যথা। স্কুলে যাব কি করে?

টুকুনের মা মুনা তখন বলেন, তুমি তো আর হেঁটে যাবে না। তোমার বাবা রিক্সা করে তোমাকে দিয়ে আসবেন।

'হেঁটে হেঁটে রিক্সায় উঠতে হবে তো মা।'

'না, তাও হবে না। তোমার বাবা তোমাকে কোলে করে রিক্সায় তুলবেন।'

মুনা ছেলের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। সবচে' যন্ত্রণা হচ্ছে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলার ব্যাপারটা। ক্লাস থ্রীতে পড়ে একটা ছেলে, সাত বৎসর মাত্র বয়স। সে কেন এত বানিয়ে কথা বলবে? আর বলার সময় এমনভাবে বলে যে, অনেকেই মনে করে সত্যিই বোধহয় কাক এসে কথা বলে। কিছুদিন আগে দেশের বাড়ি থেকে মুনার শ্বশুর এসেছেন। তাঁর শরীর খারাপ, ডাক্তার দেখাবেন। ডাক্তার দেখালেন। এক সপ্তাহ থাকলেন। যাবার সময় মুনাকে আড়ালে ডেকে নিচু গলায় বললেন, বৌমা, টুকুন এসব কি বলে?

'কাকের সঙ্গে কথা বলার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ মা।'

'এইসব ও বানিয়ে বানিয়ে বলে, বাবা। ভীষণ দুষ্ট হয়েছে। ওর যন্ত্রণায় আমরা অস্থির হয়েছি।'

'না, মানে বলছিলাম কি মা — মানে — যেভাবে বলছিল আমার আবার কিছুটা বিশ্বাস হয়ে গেল। হতেও তো পারে।'

'কি যে বলেন বাবা! কাক কথা বলবে নাকি? আর বললেও টুকুন বুঝবে কিভাবে? মানুষ কি কাকের কথা বুঝতে পারে?'

'কেউ কেউ কিন্তু পারে, মা। আমাদের এক নবী ছিলেন হযরত সোলায়মান — উনি পশু-পাখির কথা বুঝতে পারতেন।'

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, বাবা, টুকুন কোন নবী না। ও হল মহাদুষ্টু এক ছেলে। আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। এই সব কথা যখন বলতে আসবে তখন ধমক দেবেন।'

'না না, ধমকাধমকির কি আছে? বাচ্চা ছেলে।'

'ধমকাধমকি করতে হবে, বাবা। এইসব প্রশ্রয় দেয়ার কোন মানে হয় না। গালে চড় দিলে ঠিক হত। চড় দেয়া যাবে না। তার বাবা শাসন ছাড়া আধুনিক কায়দায় ছেলে মানুষ করবে। আধুনিক কায়দায় ছেলে মানুষ করার এই হল ফল।'

টুকুন খাটে পা দুলিয়ে বসে আছে।

রশিদ সাহেব একটা চেয়ার টেনে বসেছেন টুকুনের সামনে। মুনা মৃদুলাকে কোলে নিয়ে খাটের শেষ মাথায় বসেছেন। এখান থেকে টুকুনের মুখ ভাল করে দেখা যায় না। মাঝে মাঝে টুকুন যখন তাঁর দিকে তাকাচ্ছে তখনই তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন। মুনার এখন ছেলের জন্য খানিকটা মায়া লাগছে। বাচ্চা একটা ছেলের জন্যে — বিচারসভা। কোন দরকার ছিল না। বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে বলুক না। এমন কিছু ক্ষতিতো হচ্ছে না। টুকুনকে অবশ্যি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে তার বাবার দিকেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

রশিদ সাহেব বললেন, টুকুন!

'জ্বি বাবা।'

'যে কাকটা তোমার সঙ্গে কথা বলে তার নাম কি?'

'ওর কোন নাম নেই, বাবা। পাখিদের নাম থাকে না। মানুষদের নাম থাকে।'

'তোমাকে সে কি ডাকে?'

'নাম ধরে ডাকে। টুকুন বলে।'

'সে শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলে, আমাদের সঙ্গে বলে না — এর কারণ কি?'

'ও ছোটদের পছন্দ করে। বড়দের পছন্দ করে না।'

'মৃদুলা তো ছোট। ওকে পছন্দ করে না কেন?'

'মৃদুলাকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না, বাবা। ঐ দিন আমাকে বলল, তোমার ছোট বোনটার এমন বিশ্রী নাম কে রেখেছে? তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখা উচিত ছিল উকুন। তাহলে কত ভাল হত। টুকুনের বোন উকুন।'

'এইসব কথা কাকটা তোমাকে বলল?'

'জ্বি বাবা।'

'আর কি বলে?'

'মাঝে মাঝে ইংরেজী জিজ্ঞেস করে? ঐদিন বলল টুকুন আকাশ ইংরেজী কি?'

'তুমি আকাশ ইংরেজী বলতে পারলে?'

টুকুন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, পেরেছি বাবা। বানান ও বলেছি — **Sky.**।

'আচ্ছা বেশ। এখন আমার কথা মন দিয়ে শোন।'

'আমি খুব মন দিয়ে শুনছি, বাবা।

'তুমি মোটেই মন দিয়ে কথা শুনছ না। পা নাচাচ্ছ।'

'কাকটা আমাকে বলেছে, টুকুন শোন, কখনো চুপচাপ বসে থাকবে না। যদি কখনো বসে থাকতে হয় তাহলে পা নাচাবে। পা নাচালে পায়ের একসারসাইজ হয়। রক্ত চলাচল ভাল হয়। পা দু'টা ভাল থাকে। আমাদের যেমন পাখা, তোমাদের তেমনি পা।'

রশিদ সাহেব হতাশ চোখে মুনার দিকে তাকালেন। মুনা হেসে ফেললেন। অন্যদিকে তাকিয়ে হাসি লুকানোর চেষ্টা করলেন। টুকুন যেন তাঁর হাসিমুখ দেখতে না পায়। আজ হাসাহাসি না। আজ টুকুনকে গম্ভীর মুখে কিছু কথা বুঝিয়ে দেয়া হবে।

রশিদ সাহেব বললেন, টুকুন, তাকাও আমার দিকে। শোন কি বলছি। ছোটরা প্রায়ই বানিয়ে বানিয়ে নানান কথা বলে। এটা তেমন দোষের না। তবে তাকে স্বীকার করতে হবে — সে বানিয়ে বানিয়ে বলছে। কেউ যদি বানিয়ে কথা বলে তারপর সবাইকে বুঝাতে চায় কথাটা সত্যি তাহলে খুব সমস্যা। এটা তার অভ্যাস হয়ে যাবে। তুমিই বল, অভ্যাস হবে না?

টুকুন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, অভ্যাস তো হবেই। বড় হয়েও তখন মিথ্যা

কথা বলবে।

'এই তো তুমি বুঝতে পারছ। কাজেই এখন থেকে তুমি আর কাক নিয়ে কিছু বলবে না। বললে তোমারও অভ্যাস হয়ে যাবে।'

'আমার অভ্যাস হবে না, বাবা। আমি তো আর বানিয়ে বানিয়ে বলি না।'

'তুমি বানিয়ে বল না?'

'না। যা সত্যি আমি তাই বলি।

রশিদ সাহেব হতাশ গলায় বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও। মুনা ভাত দাও, ভাত খেয়ে নি।

খাবার টেবিলে টুকুন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, রশিদ সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কাক ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে তুমি কথা বলতে পার।

'কাক নিয়ে কথা বলতে পারব না?'

'না।'

টুকুন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা। রশিদ সাহেব চিন্তিত মুখে ভাত খাচ্ছেন। মুনা মৃদুলাকে খাইয়ে দিচ্ছেন। সে আটটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি রাতেই তাকে খাওয়াতে হয় ঘুমের মধ্যে।

টুকুন মা'র দিকে ঝুঁকে এসে ফিস ফিস করে বলল, মা একটা মজার জিনিস জান? তুমি যেমন মৃদুলাকে খাইয়ে দিচ্ছ, কাকও ঠিক তেমনি তার ছোট বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। ওদের তো হাত নেই। ওরা ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়।

মা বললেন, একটু আগে কি বলা হয়েছে? কাক নিয়ে আর কোন কথা না। চুপ।

টুকুন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

২

মৃদুলা এবং টুকুন এক ঘরে শোয়।

দু'জনের জন্যে দু'টা আলাদা খাট। রাতে মৃদুলা এই ঘরেই শোয়। তবে ঘুম ভাঙ্গলেই মায়ের ঘরে চলে যায়। তাদের ঘর এবং মা'র ঘরের মাঝখানে একটা দরজা। দরজা সব সময় খোলা থাকে।

মুনা এদের ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে চান। কখনো তা সম্ভব হয় না। এক একবার ঘরে ঢুকলে তাঁর কান্না পায়। দু'জনে মিলে ঘরটা কি যে করে রাখে ! মৃদুলা এম্নিতে খুব শান্ত এবং লক্ষ্মী মেয়ে হলেও ঘর নোংরা করায় তার দক্ষতা অসাধারণ। সে যা করে তা হচ্ছে শান্ত মুখে কাগজ ছেঁড়া। কাগজ ছেঁড়ার সময় সে গুন গুন করে গান গায়। গানের কথা এবং সুর দুইই বিচিত্র। গানের সুরে সে নিজেই সবচে মুগ্ধ হয়। মাথা দুলিয়ে হাসে। মুনাকে রোজ কয়েকবার ঝাঁট দিয়ে কাগজ সরাতে হয়। টুকুন কাগজ ছিঁড়ে না, ছবি আঁকে। ছবি আঁকে দেয়ালে। দেয়াল ভর্তি ছবি। এক সপ্তাহ আগে তাদের ঘর নতুন করে ডিসটেম্পার করা হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে দেয়ালে আর কোন ছবি আঁকা যাবে না।

মুনা তাদের ঘরে মশারি খাটাতে এসে দেখেন ডিসটেম্পার করা দেয়ালে ছবি আঁকা হয়েছে। কাকের ছবি। শুধু ছবি না, ছবির নিচে কবিতা।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
*বৈশাখ মাসে **কাক** গাছে বসে থাকে।*
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি,
*দুই ধারে বসে **কাক** ঢালু তার পাড়ি।*

মুনা মশারি খাটালেন। মৃদুলার গালে চুমু খেলেন। টুকুন বড় হয়েছে বলে এখন চুমু খেতে দেয় না। তবু তিনি জোর করেই চুমু খেলেন। তিনি মশারি গুঁজতে গুঁজতে বললেন, বাতি নিভিয়ে দেব, টুকুন?



'দেয়ালে কাকের ছবি আঁকা হয়েছে।'

টুকুন বলল, দাও।

'ভয় করবে না তো?'

'না।'

মুনা বাতি নিভিয়ে দিয়ে ছেলের বিছানার পাশে বসলেন। নরম গলায় বললেন, দেয়ালে ছবি তুমি এঁকেছ?

'হ্যাঁ। সুন্দর হয়েছে না মা?'

ছেলেকে কঠিন ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। বেচারা ঘুমুতে যাচ্ছে, ঘুমুক। ঘুমের আগে বকা দিয়ে মন খারাপ করিয়ে দিতে চান না। সকাল বেলা দিলেই হবে। তিনি বললেন, ছবিটা ভালই হয়েছে।

'কবিতা কেমন হয়েছে, মা?'

'কবিতা ভাল হয়েছে। কিন্তু এটা কেমন কবিতা?'

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
*বৈশাখ মাসে **কাক** গাছে বসে থাকে।*

টুকুন উৎসাহে উঠে বসল, মায়ের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আসলে কি হয়েছে জান মা, আমি তো কবিতা পড়ছিলাম, তখন কাক এসে বলল, কি পড়ছ টুকুন?

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছি, এখন বিরক্ত করবেন না।

'তুমি তাকে আপনি করে বল?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা, তারপর উনি কি বললেন?'

'উনি বললেন, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে কি কোন কবিতা লিখেছেন?'

'আমি বললাম, লিখেছেন। উনি তো বিশ্বকবি। বিশ্বকবিকে সবকিছু নিয়ে কবিতা লিখতে হয়। উনি তখন বললেন, দেখি আমাদের নিয়ে যেটা লিখেছেন সেটা একটু পড়তো। তখন আমি বানিয়ে বানিয়ে এই কবিতাটা বললাম।'

'উনি খুশি হলেন?'

'খুব খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, বাহ্, খুব সুন্দর লিখেছে, "বৈশাখ মাসে কাক গাছে বসে থাকে।" বিশ্বকবি বলেই এত সুন্দর লিখতে পেরেছেন। গ্রাম-কবি, দেশ-কবি হলে পারতেন না। অতি উচ্চমানের কবিতা হয়েছে।'

মুনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে মনে বললেন, কি করা যায় এই ছেলেকে

নিয়ে?

টুকুন বলল, মা, উনি এত খুশি হলেন যে আমাকে বললেন, টুকুন, একটা কাজ কর তো — দেয়ালে আমার একটা ছবি এঁকে তার নিচে কবিতাটা লিখে রাখ। আমি বললাম, মা রাগ করবে। দেয়ালে নতুন করে ডিসটেম্পার করা হয়েছে। তখন উনি বললেন, না, তোমার মা রাগ করবেন না। উনাকে বুঝিয়ে বললেই হবে। কথায় কথায় ছেলেমেয়েদের উপর রাগ করা ভাল না। মা, তুমি কি রাগ করেছ?'

'না।'

'বাবাকে তুমি কি বুঝিয়ে বলতে পারবে?'

'দেখি চেষ্টা করে পারি কি-না। তুমি এখন ঘুমাও।'

ঘুমুতে যাবার সময় মুনা কাক এবং কাকের কবিতার কথা বললেন। চিন্তিত গলায় বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? মাথা থেকে কাক কি করে দূর করা যায়?

রশিদ সাহেব বললেন, গরমের ছুটি হোক, ওকে নিয়ে কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে আসি। ওর এই কাক নিশ্চয়ই এত দূর যাবে না। কিছুদিন পার হলে ভুলে যাবে।

মুনা বললেন, তোমার কি মনে হয় কোন ডাক্তার-টাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার?

রশিদ সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, আরে দূর। এটা তো কোন অসুখ না যে ডাক্তার চিকিৎসা করবে। ছেলেমানুষি খেয়াল। দু'দিন পর কেটে যাবে। আচ্ছা, কোন কাক কি সত্যি ওর জানালায় বসে?

মুনা বিরক্ত হয়ে বললেন, শেষ পর্যন্ত তোমারও বিশ্বাস হয়ে গেল? কাক তো সব সময়ই বসে। জানালায় বসে, রেলিং-এ বসে।

'ও পড়াশোনা কেমন করছে?'

'ভালই করছে। ক্লাস টেস্ট হয়েছে। অংকে একশ'তে পেয়েছে একশ'।'

'তাহলে মনে হয় চিন্তার কিছু নেই।'

'চিন্তা তো আমি করছি না। সারাদিন কাক কাক করে এই জন্যে বিরক্তি লাগে।

রশিদ সাহেব লেখা নিয়ে বসলেন। তিনি ব্যাংকে কাজ করেন, তবে সেই সঙ্গে লেখালেখিও করেন। তাঁর সব লেখাই বাচ্চাদের জন্যে। এখন একটি মজার বই ...ন — নাম 'একি কান্ড!' খুব মজার একটা বই।

৩

টুকুনদের বাসায় ছোট ফুপু এসেছেন।

ছোট ফুপু পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত। ক'দিন পরেই তাঁর M.Sc পরীক্ষা। তাঁর দম ফেলার সময় নেই। তিনি বাসায় ঢুকেই বললেন, ও টুকুন, তোদের বাড়িতে দম ফেলতে এসেছি।

টুকুনের এত ভাল লাগল। ছোট ফুপুকে তার খুব ভাল লাগে। তার কাছে মনে হয় এরকম মেয়ে অন্য কোন গ্রহে হয়ত আছে। কিন্তু পৃথিবীতে আর নেই। আর দেখতেও কি সুন্দর। শুধু তাকিয়ে থাকতে হয়।

ছোট ফুপু যখন বড়দের সঙ্গে কথা বলেন তখন তাঁকে বড়দের মত লাগে, যখন ছোটদের সঙ্গে কথা বলেন তখন ছোটদের মত লাগে। তিনি বাসায় এলে কিছুক্ষণ টুকুন এবং মৃদুলার সঙ্গে খেলবেন। মৃদুলাকে বলবেন, কই রে 'মৃদু', তোর বারবি নিয়ে আয়, এখন কিছুক্ষণ পুতুল খেলব। আয়, আমরা বারবিকে বিয়ে দিয়ে দি। মৃদুলা বারবি আনবে না কাগজ নিয়ে আসবে। ছোটফুপু কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কাগজ ছিড়বেন। মৃদুলা খিলখিল করে হাসবে, তিনিও হাসবেন। মৃদুলার সঙ্গে খেলা শেষ হলে টুকুনকে বলবেন, আয় টুকুন, এবার তোর সঙ্গে খেলি। কি খেলবি? টুকুন যদি বলে, চোর-পুলিশ খেলবে তাহলে ফুপু মুখ বাঁকিয়ে বললেন, দূর গাধা! চোর-পুলিশ পুরনো খেলা, আয় নতুন কিছু খেলি। চোর-পুলিশের চেয়েও মারাত্মক — ডাকাত-পুলিশ। তুই হবি ডাকাত, আমি মহিলা পুলিশ।

এমন একজন মানুষ বাসায় এলে আনন্দে লাফাতে ইচ্ছা করে। টুকুন মনের আনন্দ চেপে রেখে বলল, কতক্ষণ থাকবে ছোট ফুপু?

'দম ফেলতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ থাকব। তারপর চলে যাব। এখনো কিছু পড়া হয়নি, পঁচিশ তারিখ থেকে পরীক্ষা।'

'দম কোথায় ফেলবে?'

'কোন একটা ভাল জায়গা দেখে ফেলতে হবে।'

'আমার ঘরে ফেলবে?'

'ফেলা যায়।'

টুকুন এবং মৃদুলা ছোট ফুপুকে তাদের ঘরে নিয়ে এল। ছোট ফুপু ঘর দেখে

আঁৎকে উঠে বললেন, ঘরটাকে তো আস্তাবল বানিয়ে রেখেছিস।

টুকুন বলল, আস্তাবল কি ছোটফুপু?

'আস্তাবল হচ্ছে যেখানে ঘোড়া থাকে। তোদের এই নোংরা ঘরে দম ফেলতে পারব না। দমটা বরং আটকে রাখি।'

টুকুন বলল, তাই ভাল, আটকে রাখ ফুপু।

'দেয়ালে এটা কিসের ছবি রে টুকুন?'

'কাকের ছবি।' ভাল হয়েছে না?'

'মোটামুটি হয়েছে। দেয়ালে ছবি আঁকার জন্যে বকা খাসনি?'

'না।'

'ছবির নিচে এটা কি কবিতা নাকি?'

'হুঁ।'

'কবিতাটাও তো অসাধারণ হয়েছে রে — অসাধারণ। তোর লেখা না রবীন্দ্রনাথের লেখা?'

'আমরা দু'জনে মিলে লিখেছি।'

'ভাল হয়েছে অসাধারণ। এখন আমার কথা শোন — ঘর পরিষ্কার কর যাতে আরাম করে দমটা ফেলতে পারি। অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। এই ফাঁকে তোর মা'র সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'মার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলবে না কিন্তু।'

'পাগল হয়েছিস? বড়দের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।'

অপলা মুনার সন্ধানে গেল। মুনা চা বানাচ্ছিলেন, অপলাকে দেখে বললেন, তুই নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিস পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবি না? আজ চলে এলি যে!

অপলা হাসিমুখে বলল, তোমার ছানাদের দেখতে এসেছি। কিছুদিন পর পর ওদের না দেখলে ভাল লাগে না।

'অনেকদিন পর পর দেখিস বলে ভাল লাগে। আমার মত সারাক্ষণ দেখতে হলে মাথা খারাপ হয়ে যেত। ছ'শ টাকা খরচ করে দেয়াল ডিসটেম্পার করিয়েছি। কাকের ছবি এঁকে রেখেছে।'

'এত পাখি থাকতে কাক কেন?'

'সে তো আজকাল কাকের সঙ্গে কথা বলে! শুনিসনি কিছু?'

'না তো।'

'একটা কাক নাকি তার জানালার পাশে বসে গল্প-গুজব করে।'

'বাহ্, কি মজা!'

মুনা বিরক্ত গলায় বললেন, মজার তুই কি দেখলি? এই বয়সে মিথ্যা কথা বলা শিখছে!

'কল্পনা করতে শিখছে। মিথ্যা এক জিনিস, কল্পনা ভিন্ন জিনিস। তোমরা ওকে কিছু বলো না।'

মুনা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, কল্পনা ভাল। খাপছাড়া কল্পনা ভাল না। দিনরাত কাক, কাক। বাড়িঘর ভরাচ্ছে ছবি এঁকে। তোর কথা মন দিয়ে শুনে, তুই যাবার আগে টুকুনকে বুঝিয়ে যাবি।

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি নয়, ভাল করে বুঝাবি। দেয়ালে যেন ছবি আঁকা না হয় সেটাও বলবি।'

'এক্ষুণি বলছি।'

অপলা চায়ের কাপ হাতে উঠে গেল।

টুকুন ঘর পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। অবশ্যি মৃদুলা এখনো কাগজ ছিঁড়ে যাচ্ছে। লেখা কাগজ তার ছিঁড়তে ভাল লাগে না। ধবধবে সাদা কাগজগুলি ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। টুকুনের ধারণা, মৃদুলা বড় হয়ে বিরাট একটা কাগজের দোকান দেবে। সুন্দর কাগজে ঘর থাকবে ভর্তি। সে মনের আনন্দে ছিঁড়বে।

অপলা চায়ের কাপ হাতে খাটে বসতে বসতে বলল, ও টুকুন, তুই না কি কাকের সঙ্গে কথা বলিস?

'বলি তো।'

'তা কি নিয়ে তোদের কথাবার্তা হয়?'

'কোন ঠিক নেই। একেক দিন একেকটা। ঐ দিন বললেন, টুকুন, একটা গান গেয়ে শুনাও তো।'

'তোকে তুমি করে বলেন?'

'তা তো বলবেনই। বয়সে বড় না? উনার ছোট মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেছে।'

'তাহলে তো খুবই সিনিয়ার লোক! তুই তাঁকে কি ডাকিস — চাচা?'

'না, আমি ডাকি কাকা। চাচা ডাকতে চাচ্ছিলাম, উনি বললেন, চাচা ডাকবে না বরং কাকা ডাক। কাকা ডাকলে কাকের সঙ্গে মিল হয়, শুনতে ভাল লাগে।'



ও টুকুন তুই নাকি কাকের সঙ্গে কথা বলিস?

'অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, উনাকে খুবই চিন্তাশীল মনে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ, ফুপু। খুবই চিন্তশীল। প্রায়ই বলেন, দেশটার হচ্ছে কি? দেশটা তো রসাতলে যাচ্ছে।'

অপলা চাপা হাসি হেসে বলল, এই কথা তো তোর বাবা সবসময় বলে। তোর বাবার কাছে শুনে শুনে শিখেনি তো?

'শিখতেও পারেন। উনার স্মৃতিশক্তি ভাল। যখন যা শুনেন উনার মনে থাকে। অনেকদিন আগে একবার বলেছিলাম, ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ আমার জন্মদিন। উনার দেখি মনে আছে। আমাকে বললেন, কি খোকা, জন্মদিন হচ্ছে?

আমি বললাম, হচ্ছে।

উনি বললেন, প্রবলেম হয়ে গেল। ঐদিন রোববার পড়ে গেছে। ছুটির দিন। রোববার আমি আবার ঘুরে ফিরে বেড়াতে পছন্দ করি। আসতে পারি কি না বুঝতে পারছি না।

অপলা বলল, আসুক না আসুক, তুই দাওয়াত দিয়ে রাখ।

'দাওয়াত দিয়েছি ছোট ফুপু।'

'ভাল করেছিস। খালি হাতে নিশ্চয়ই আসবে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই আনবে।'

টুকুন আগ্রহের সঙ্গে বলল, ছোট ফুপু, কি আনবে বলে তোমার মনে হয়?

অপলা গম্ভীর গলায় বলল, আমার ধারণা, মরা ইঁদুর-টিঁদুর নিয়ে আসবে। মরা ইঁদুর ওরা খুব আনন্দ করে খায়। ওদের কাছে খুবই দামী জিনিস।

টুকুন বিস্মিত হয়ে বলল, মরা ইঁদুর দিয়ে আমি কি করব?

অপলা বলল, কি আর করবি, খাবি। তোর পেয়ারের একজন এত আগ্রহ করে একটা জিনিস দেবে, আর তুই ফেলে দিবি; তা তো হয় না।

টুকুন ছোট ফুপুর দিকে তাকিয়ে আছে। অপলা খুব চেষ্টা করছে হাসি চেপে রাখার। এক সময় আর পারল না। হো হো করে হেসে ফেলল। মৃদুলাও হাসতে শুরু করল। দু'জনই হাসছে। ওদের দিকে দুঃখিত চোখে তাকিয়ে আছে টুকুন। আর তখন এক কাণ্ড হল — একটা দাঁড়কাক এসে ঝপ করে বসল জানালার শিকে। অপালার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে থেকে ডাকল — কা কা।

হাসি থামিয়ে অপলা বলল, এই টুকুন, তোর আংকেল এসে গেছে মনে হয়। আমাকে কিছু বলছে না-কি?

টুকুন কিছু বলল না। কাকটা আবার ডাকল — কা কা কা।

অপলা বলল, চুপ করে আছিস কেন? ও বলছে কি?

'তুমি কেন হাসছ তাই জানতে চাচ্ছে।'

'বলে দে আমি কেন হাসছি।'

'আমি কিছু বলব না।'

'বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। কি বলে উনাকে ডাকব তাই ভাবছি। তোর যখন কাকা হয়, তখন আমার হবে বড় ভাই। ভাইয়া ডাকব?'

'তোমার যা ইচ্ছা ডাক।'

অপলা জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যালো ভাইজান, আমি কোন কারণ ছাড়াই হাসছি। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। আপনি মনে হয় টুকুনের জন্মদিনে আসবেন। খালি হাতে আসবেন না। উপহার নিয়ে আসবেন।

কাকটা বলল, কা কা কা।

অপলা বলল, আপনি আবার দলবল নিয়ে আসবেন না। একা আসবেন। এখন বরং বাড়ি চলে যান।

কাক সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। অপলা দেখল টুকুন গম্ভীর হয়ে আছে। মনে হচ্ছে রাগ করেছে। তার বড় বড় চোখ ভিজে আছে। কেঁদে ফেলার আগে আগে টুকুনের চোখ এরকম হয়ে যায়। অপলা বলল, কি রে টুকুন, এরকম করে তাকিয়ে আছিস কেন? আমার উপর রাগ করেছিস?

'হুঁ।'

'কেন! আমি কি করলাম?'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি। এই জন্যে আমি রাগ করেছি। তুমি যা বল আমি তা বিশ্বাস করি। তুমি কেন আমার কথা বিশ্বাস কর না?'

'তুই চাস আমি তোর কথা বিশ্বাস করি?'

'হ্যাঁ।'

'শোন্ টুকুন, আমি অন্য বড়দের মত না। আমি ছোটদের কথা মন দিয়ে শুনি এবং বিশ্বাস করার চেষ্টা করি। কিন্তু তোর কথা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না?'

'কেন যাচ্ছে না?'

'বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, কারণ মানুষের পক্ষে কথা বলা সম্ভব, পাখির পক্ষে সম্ভব না। মানুষের মাথায় অনেকখানি মগজ। পাখির মগজ আর কতটুকু! এই একটুখানি। লবণের চামচে একচামচ। এত অল্প মগজ নিয়ে পাখির পক্ষে কথা বলা সম্ভব না।'

'ময়নাও তো কথা বলে। ময়নার মগজও তো একটুখানি।'

'ময়না বলে শেখানো কথা। তাও একটা-দু'টা বাক্য — 'কুটুম এসেছে পিড়ি দাও' — এই রকম। এর বেশি না। তাছাড়া ময়না যখন কথা বলে আমরা সবাই তা শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি। এখানে কাক কথা বলছে আর তুই একা শুধু বুঝতে পারছিস তা তো হয় না। তুই তো আলাদা কিছু না। তুই আমাদের মতই একজন। তোর দু'টা হাত, দু'টা পা, দু'টা চোখ . . . আমাদেরও তাই। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'বুঝতে পেরে থাকলে আমার দিকে তাকিয়ে বিরাট একটা হাসি দে। দাঁত বের করে হাস।'

টুকুন হাসল না, গম্ভীর গলায় বলল, আচ্ছা ছোট ফুপু, কাকটা যদি আমার জন্মদিনে আমার জন্যে কোন উপহার নিয়ে আসে তাহলে কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

অপলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যদি সত্যি সত্যি তোর জন্যে সে উপহার নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাবতে হবে। কোন কিছুই চট করে বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস করলে খুব সমস্যা। বিরাট সমস্যা। ভয়ংকর সমস্যা।'

'কি সমস্যা?'

'ধর, একজন লোক এসে বলল, ঢাকার নিউ এলিফেন্ট রোডে বাটার জুতার দোকানের সামনে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে। একটা বাঘ বের হয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়ে খেয়ে ফেলছে। এখন যদি লোকটার কথায় বিশ্বাস করে সবাই ঢাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? এট কি ঠিক হবে টুকুন?

'না, ঠিক হবে না।'

'তাহলে তুই এখন বুঝতে পারছিস যে আমাদের চট করে কিছু বিশ্বাস করতে নেই?'

'পারছি।'

'এই কারণেই আমি তোর কথা বিশ্বাস করছি না। তবে তোর জন্মদিন আসুক, দেখা যাক তোর কাক কি উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর আমরা না হয় আবার চিন্তা-ভাবনা করব। এখন একটু হাস তো লক্ষ্মী সোনা।'

টুকুনের রাগ লাগছে। হাসতে ইচ্ছা করছে না। তবু ছোট ফুপুকে খুশি করার জন্যে সে হাসল।

৪

আজ টুকুনের জন্মদিন।

টুকুন ভেবেছিল জমকালো জন্মদিন হবে। লোকজনে বাড়ি ভরে যাবে। বিরাট একটা কেক আসবে। সাতটা মোমবাতি জ্বলবে। সে ফু দিয়ে মোমবাতি নেভাবার সময় মনে মনে একটা জিনিস চাইবে। যা চাইবে তাই হবে। এই হল নিয়ম। দেখা গেল জন্মদিনে কেউ আসছে না।

রশিদ সাহেব বিকেলে অফিস থেকে ফিরলেন খালি হাতে। উপহারের কোন প্যাকেট তাঁর হাতে দেখা গেল না। এক সময় টুকুন তার মা'র কাছে গিয়ে বলল, জন্মদিনের কেক আনতে কে যাবে মা?

তিনি বললেন, কেউ যাবে না। তোমাকে গত জন্মদিনে আমরা কি বলেছিলাম? সাত বছর বয়স পর্যন্ত জন্মদিন হবে। তারপর আর হবে না। তোমার বাবার এসব পছন্দ না। আমারো না।

'কেউ আসবে না মা?'

'না, কেউ আসবে না। কাউকে আসতে বলিনি। তবে কেউ যদি নিজ থেকে চলে আসে তাহলে আসবে। যেমন ধর তোমার ছোট ফুপু। সে তো আসবেই।'

'উপহারও আনবে। তাই না মা?'

'হ্যাঁ উপহার আনবে।'

'তোমরা কি কিছু কিনেছ আমার জন্যে?'

'আমরা একটা উপহার কিনেছি। তবে তা তোমাকে দেয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। তোমার বাবা চিন্তা করছেন। তিনি যদি মনে করেন তোমাকে দেয়া যায় তাহলে হয়তো-বা দেয়া হবে।

'কতক্ষণ লাগবে তাঁর চিন্তা শেষ করতে?'

'তা তো বলতে পারি না।'

টুকুন মন খারাপ করে ঘুরতে লাগল। তার কিছু ভাল লাগছে না। অবশ্যি সে

এখনো আশা ছাড়েনি। তার কেন জানি মনে হচ্ছে সন্ধ্যার পর দেখা যাবে এক এক করে বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে। তাঁদের টুকুনের জন্মদিনের কথা বলা হয়নি, তবে তারিখটা তাঁদের মনে ছিল বলে নিজে থেকেই চলে এসেছেন। এত মানুষজন এসেছে দেখে শেষ মুহূর্তে বাবা বলবেন — আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কেক না হয় কিনে নিয়ে আসি।

সন্ধ্যার পরও কেউ এল না। এমন কি ছোট ফুপুও না। তবে ছোট ফুপু টেলিফোন করলেন।

'হ্যালো টুকুন সোনা, শুভ জন্মদিন।'

টুকুন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

ছোট ফুপু টুকুনের কাঁদো গলা ধরতে পারলেন না। তিনি হাসিমুখে বললেন, খুব মজা হচ্ছে, তাই না?

'হুঁ।'

'কেক কি কাটা হয়ে গেছে?'

'এখনো হয়নি।'

টুকুনের চোখে এবার সত্যি সত্যি পানি এসে গেল। টেলিফোনে চোখের পানি দেখা যায় না বলে রক্ষা। দেখা গেলে সমস্যা হত।

'টুকুন!'

'জ্বি।'

'তোর গলা এমন শুনাচ্ছে কেন? সর্দি লেগেছে না-কি?'

'হুঁ।'

ছোট ফুপু বললেন, আমার কোন অসুখ-বিসুখ হলে ভাল হত। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে পারতাম। অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু হচ্ছে না। দিন-রাত ফিজিক্স পড়তে হচ্ছে। এখন পড়ছি ফ্লুয়িড ডায়নামিক্স — অতি বিশ্রী জিনিস।'

'আমার উপহার কিনেছ ছোট ফুপু?

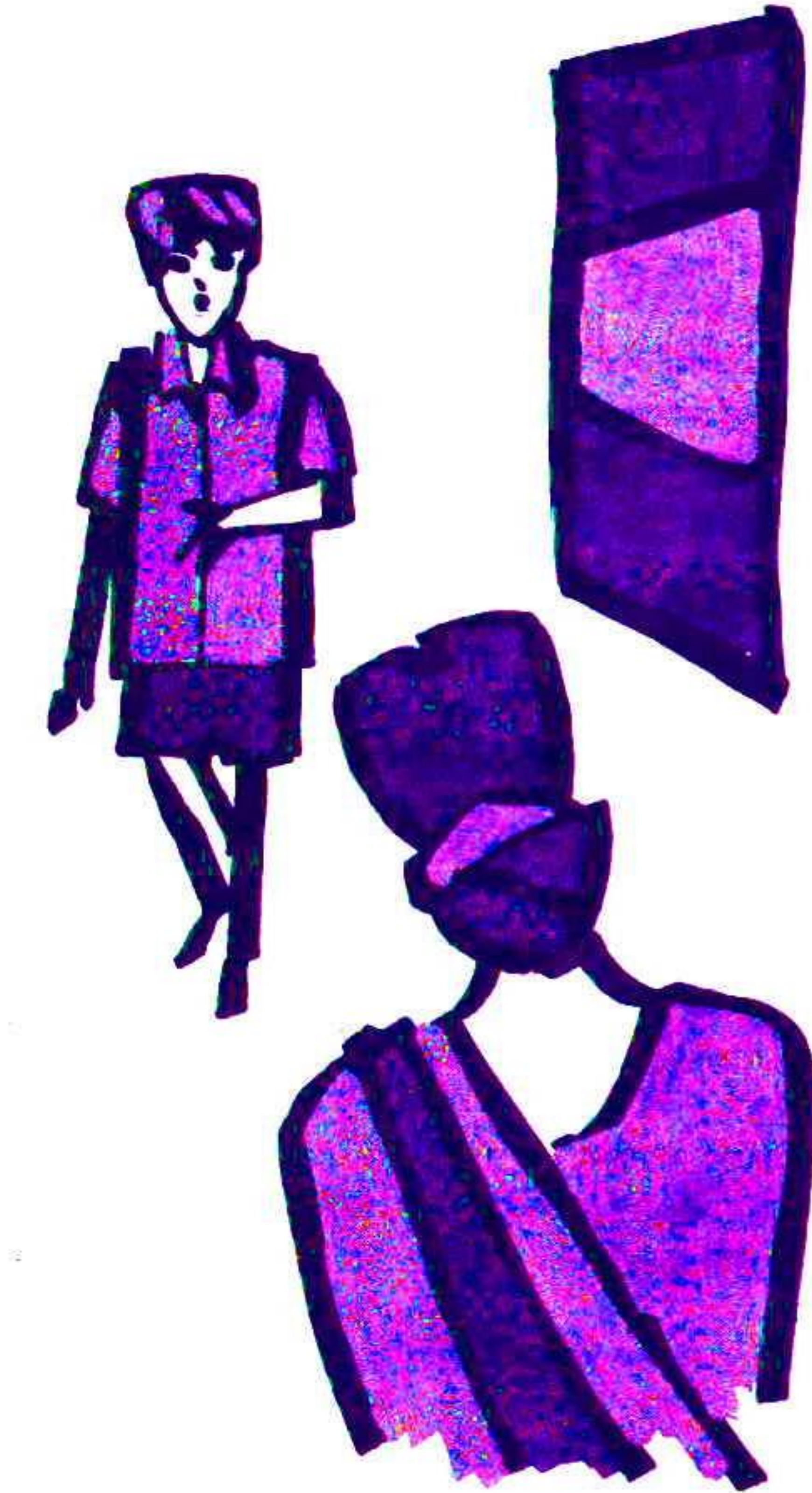
'না, কেনা হয়নি। ঘর থেকে বের হতে পারি না — উপহার কিনব কি? একসময় কিনে এসে দিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

'ভাল কথা, তোর কাক কি উপহার নিয়ে এসেছে?'

'আসেনি।'

'কি মনে হয় তোর — আসবে?'



হ্যালো টুকুন সোনা, শুভ জন্মদিন !

'জানি না।'

'এলে টেলিফোন করিস।'

'আচ্ছা।'

টুকুন তার নিজের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। আজ মৃদুলাও এই ঘরে নেই। তার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে। চোখ লাল। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। মুনা তাকে নিয়ে যাবেন ডাক্তারের কাছে। তাকে গরম কাপড় পরানো হচ্ছে।

রশিদ সাহেব এসে টুকুনকে ডেকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আমার সামনে চেয়ারের উপর শান্ত হয়ে বস তো টুকুন।

টুকুন বসল।

'তোমার মনটা কি খারাপ? মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

'মনে হয় ঠাণ্ডা লাগবে।'

' তোমার জন্মদিন হচ্ছে না — এই জন্যে মন খারাপ না তো?'

টুকুন কিছু বলল না। চুপ করে রইল। রশিদ সাহেব বললেন, তোমাকে তো আগেই বলেছি গতবারই ছিল শেষ জন্মদিন। বলিনি?

'হ্যাঁ।'

'বুঝলে টুকুন — ঢাকা শহরে অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে যারা এই প্রচণ্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে ঘুমায়। গায়ে দেবার মত ওদের একটা গরম স্যুয়েটার পর্যন্ত নেই। সেখানে হৈচৈ করে জন্মদিন করা ঠিক না। আমি তোমার জন্মদিনের টাকা দিয়ে উলেন গরম কাপড় কিনে ওদের বিলি করেছি। ভাল করিনি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি মুখে অবশ্যি বলছ হ্যাঁ তবু মন খারাপ করে আছ। আজ তোমার কাছে খারাপ লাগছে কিন্তু যখন বড় হবে তখন খারাপ লাগবে না। তখন ভাল লাগবে। তখন বলবে, বাবা যা করেছেন ভাল করেছেন এদেশের সব বাবাদের এটা করা উচিত।'

'আমি যাই বাবা?'

'না বোস। আমার কথা শেষ হয়নি। আমি তোমার জন্যে একটা উপহার কিনেছি — দেখ পছন্দ হয় কি না।'

বাবা টুকুনের হাতে উপহার তুলে দিলেন। কি যে সুন্দর উপহার! এত বড় একটা রঙ-তুলির বাকস। ব্রাশই হচ্ছে তিনটা। এত বড় রঙের বাকস মনে হয় পৃথিবীতে আর নেই। এই একটাই বোধহয় তৈরি হয়েছিল। বাবা কিনে নিয়ে

এসেছেন।

'পছন্দ হয়েছে টুকুন?'

'হ্যাঁ। খুব পছন্দ হয়েছে। খুব খুব খুব।'

রশিদ সাহেব বললেন, তুলির বাক্সটা তো তোমার হাতে দেয়া যাবে না, বাবা। এটা থাকবে আমার ড্রয়ারে তালাবন্ধ। তোমার যখন ছবি আঁকতে ইচ্ছা করবে আমার সামনে বসে ছবি আঁকবে।

'কেন বাবা?'

'কারণ তোমার হাতে রঙ-তুলি দিলেই তুমি ছবি এঁকে সারা দেয়াল ভর্তি করবে। এটা তোমাকে করতে দেয়া হবে না। এখন কি ছবি আঁকতে চাও?'

'না।'

'বেশ, আমি তাহলে ড্রয়ার তালাবন্ধ করে রাখছি।'

টুকুনের বাবা-মা মৃদুলাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। টুকুন একা একা তার ঘরে বসে রইল। বাড়িতে সে অবশ্যি একা না, রহিমা'র মা আছে। সে রান্নাঘরে রান্না করছে। টুকুনের কিছুই ভাল লাগছে না। সুকুমার রায়ের বই নিয়ে বসল। পড়ার চেষ্টা করল।

চলে হন্ হন্ ছোটে পন্ পন্
ঘোরে বন্ বন্ কাজে ঠন্ ঠন্
বায়ু শন্ শন্ শীতে কন্ কন্
কাশি খন্ খন্ ফোড়া টন্ টন্
মাছি ভন্ ভন্ থালা ঝন্ ঝন্

অন্য সময় এই কবিতা এত ভাল লাগত! আজ একেবারে মাথা ধরে যাচ্ছে। টুকুন বই বন্ধ করল, আর তখনি কাকটা এসে বসল জানালার পাশে। গম্ভীর গলায় বলল, শুভ জন্মদিন।

টুকুন বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

কাকটা বলল, গেস্টরা সব চলে গেছেন?

'হুঁ'

'আমি ইচ্ছা করেই দেরি করে এলাম। লোকজনের ভিড় ভাল লাগে না। বয়স

হয়েছে তো। হৈচৈ-এ মাথা ধরে যায়। কেক কাটা হয়েছে?'

'কেক কেনা হয়নি।'

'সে কি! কেন?'

'বাবা বললেন, আর জন্মদিন হবে না। এখন থেকে জন্মদিনের টাকায় গরীবদের গরম কাপড় কিনে দেবেন।'

'ও আচ্ছা।'

'উনি লেখক তো, এই জন্যে গরীবদের কষ্ট দেখলে তাঁর খারাপ লাগে।'

'এ আবার কেমন কথা? গরীবদের কষ্ট দেখলে শুধু লেখকদের কেন সবারই খারাপ লাগে। আমি তো লেখক না। আমি হলাম গিয়ে কাক। আমার নিজেরই খারাপ লাগে। যাই হোক, তুমি মন খারাপ করবে না।'

'মন খারাপ করিনি।'

'এই ত মিথ্যা কথা বললে — মুখ অন্ধকার করে বসে আছ আর মুখে বলছ মন খারাপ করিনি। হাস তো।'

টুকুন হাসলো।

কাক বলল, তোমার হাসি খুব সুবিধার লাগছে না। মনে হচ্ছে কষ্ট করে হাসছ। গল্প শুনবে? গল্প শুনতে চাইলে গল্প বলতে পারি, বলব?

'বলুন।'

'এক দেশে ছিল এক কাক। কাকটা এক টুকরা মাংস খুঁজে পেয়ে খুব খুশি হয়ে গাছের ডালে বসল। তখন একটা শিয়াল ঠিক করল কাককে বোকা বানিয়ে মাংসটা নিতে হবে . . .।

'এই গল্প আমি জানি। এটা ঈশপের গল্প।'

'ঈশপ ভুল গল্প বলেছে। আসল গল্প বলেনি। আসল গল্পটা তোমাকে শুনাচ্ছি। তারপর হল কি — শিয়ালটা বলল, কাক ভাই, কাক ভাই! কি মধুর তোমার গানের গলা! তুমি যখন সকাল বেলা কা কা সুরে গান গাও এত ভাল লাগে। ভৈরবি রাগিনীতে আর কোন পাখি এমন কা কা করতে পারে না। একমাত্র তুমিই পার। তুমি আমাকে একটা গান গেয়ে শুনাও না। গান শোনার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে।

কাক শিয়ালের চালাকি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল। সে কা কা করবে আর মুখ থেকে মাংসের টুকরা নিচে পড়ে যাবে। শিয়াল সেটা খাবে মহানন্দে। কাজেই কাকটা করল কি — পায়ে নখ দিয়ে মাংসের টুকরা চেপে রেখে সুন্দর করে গান

গাইল। গানের কথাগুলি হল ঃ

কা কা কা
শিয়াল ব্যাটা বোকা, কা কা কা।
মহা বোকা, বেজায় বোকা, কা কা কা।

বুঝলে টুকুন — এটা হল আসল গল্প। ঈশপের গল্পটা নকল। তোমার বাবা তো লেখক মানুষ। তাঁকে বল তো আসল গল্পটা লিখে ফেলতে।'

'আচ্ছা বলব।'

'আর শোন, তোমার জন্মদিনে খালি হাতে আসা ঠিক হবে না দেখে সামান্য উপহার নিয়ে এসেছি। জানি না তোমার পছন্দ হবে কি না।'

টুকুন আনন্দিত গলায় বলল, কি এনেছেন?

'একটা ঝেং-এর বাচ্চা।'

'কিসের বাচ্চা?'

'ঝেং-এর।'

টুকুন বিস্মিত হয়ে বলল, কই আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

'ঝেং-এর বাচ্চা চোখে দেখা যায় না, টুকুন। ঝেং-এর বাচ্চা হয় অদৃশ্য। শুধুমাত্র পাখিরাই ঝেং-এর বাচ্চা দেখতে পায়। ঝেং এর বাচ্চা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। খেলবে কিন্তু কেউ চোখে দেখবে না।'

'বাহ্, কি মজা!'

'মজা তো বটেই। তা ছাড়া ঝেং-এর বাচ্চাগুলি কাউকে কামড়ায় না — কিছু করে না। মাঝে মাঝে শুধু সুড়সুড়ি দেয়।'

'হাত দিলে বোঝা যায়?'

'না, হাত দিয়েও কিছু বুঝবে না।'

'বাহ, মজা তো।'

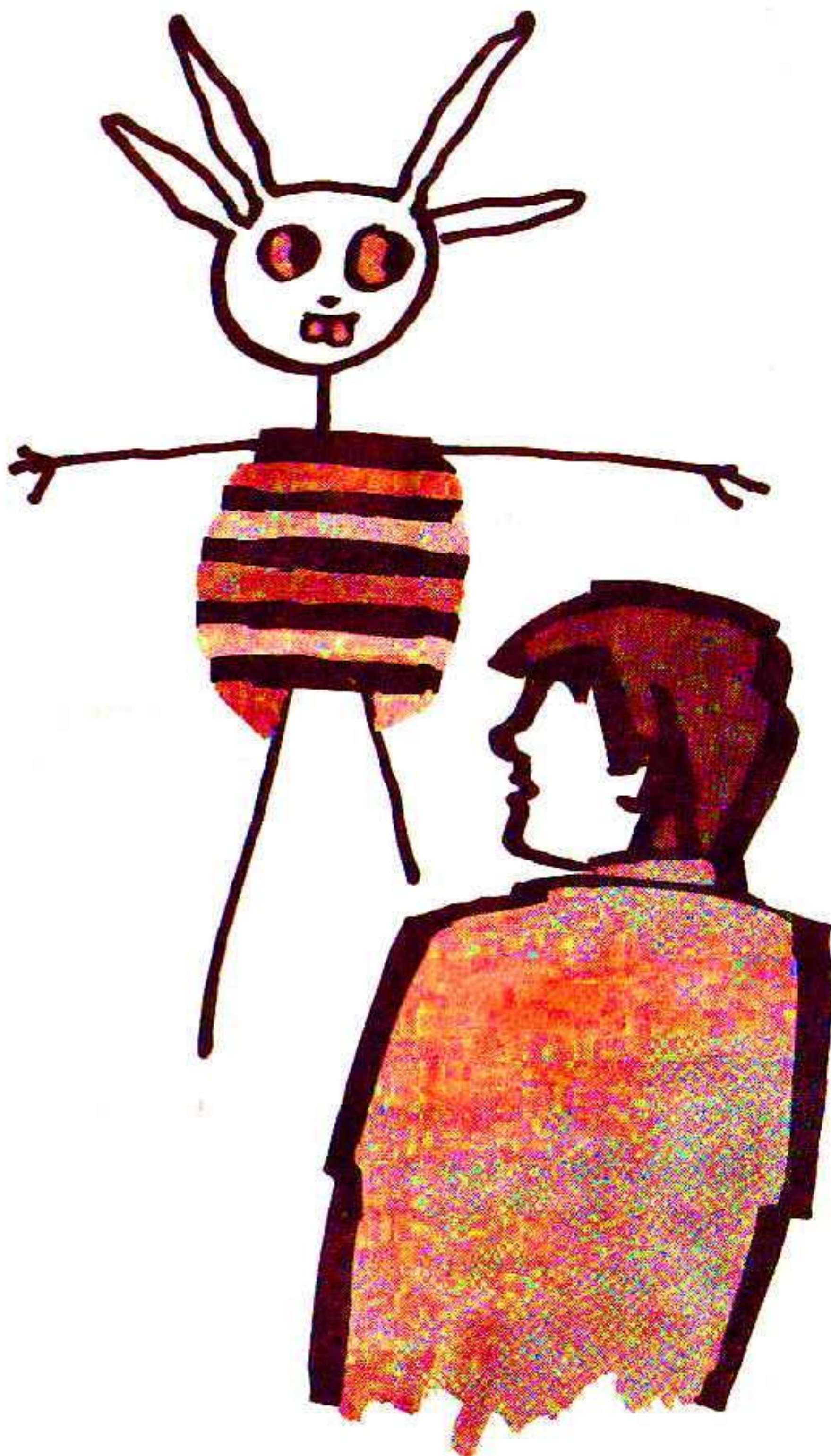
'দারুণ মজা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কি খায়?'

'কাগজ খায়। তোমাদের বাসায় তো কাগজের অভাব নেই। বাবা লেখক মানুষ। তাছাড়া মৃদুলা তো ক্রমাগতই কাগজ ছিঁড়ছে।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কি কথা বলতে পারে?'

'না। তবে মাঝে মাঝে খিল খিল করে হাসে। তাও খুব আস্তে। খুব মন দিয়ে না



একটা ঝেং এর বাচ্চা

শুনলে বুঝতেও পারবে না।'

'ঝেং এর বাচ্চা এখন কোথায় আছে?'

'ও এখন তোমার বিছানায় বসে আছে।'

'ও দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দর। ছোট্ট উলের বলের মত। খরগোশের মত বড় বড় কান। তবে দু'টা কান না, চারটা কান।'

'লেজ আছে?'

'না, লেজ নেই।'

'আমি ওকে কাগজ দিলে কি ও খাবে?'

'না। মানুষের সামনে ঝেং-এর বাচ্চা কখনো কিছু খায় না। যখন কেউ থাকে না তখন সে কপ করে কাগজ গিলে ফেলে।'

'ইশ, কি আশ্চর্য!'

'তুমি খুশি হয়েছ টুকুন?'

'দারুণ খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

কাক উড়ে চলে গেল। টুকুনের ইচ্ছা করছে ঝেং-এর বাচ্চার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে। তা সম্ভব নয়। একে চোখে দেখা যায় না। টুকুন গাঢ় গলায় বলল, ঝেং-এর ছানা, আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব খুশি। এই নাও তোমাকে কিছু কাগজ দিলাম। খিদে লাগলে খেও। আমি এখন ছোট ফুপুকে টেলিফোন করতে যাচ্ছি।

'হ্যালো ছোট ফুপু।'

'কিরে টুকুন! হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'দারুণ ব্যাপার হয়েছে, ছোট ফুপু।'

'দারুণ ব্যাপার আমারো হয়েছে। সারা সকাল সারা দুপুর ফ্লুয়িড ডায়নামিক্স পড়ে পড়ে এখন মনে করতে গিয়ে দেখি সব ভুল মেরে বসে আছি। কিছু মনে নেই। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। তোর দারুণ ব্যাপারটা কি?'

'কাক এসেছিলেন।'

'ও আচ্ছা, এসেছে তাহলে! খালি হাতে এসেছে, না কিছু নিয়ে এসেছে?'

'নিয়ে এসেছেন।'

'কি আনল — মরা ইঁদুর, না মুরগির নাড়িভুড়ি।'

'উনি ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে এসেছেন।'

'কিসের বাচ্চা বললি?'

'ঝেং-এর বাচ্চা।'

'সেটা আবার কি?'

'খরগোশের কানের মত লম্বা লম্বা চারটা কান আছে। গোল, উলের বলের মতো।'

'তুই দেখে বলছিস?'

'না ছোট ফুপু। ঝেং-এর বাচ্চা তো দেখা যায় না। ঝেং-এর বাচ্চা হয় অদৃশ্য।'

'অদৃশ্য!'

'হ্যাঁ অদৃশ্য। ওদের গায়ে হাতও দেয়া যায় না।'

'বুঝলি কি করে চারটা বড় বড় কান?'

'কাক বলে গেছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কি খায় জান?'

'না।'

'কাগজ খায়। আর কিচ্ছু খায় না।'

অপলা টেলিফোনেই ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, টুকুন তুই তো বুদ্ধিমান ছেলে। ক্লাসের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হোস। এই বয়সেই সুকুমার রায়ের সব কবিতা মুখস্থ। তুই কি করে বিশ্বাস করিস যে ঝেং-এর বাচ্চা বলে একটা জিনিস আছে যাকে চোখে দেখা যায় না? যার গায়ে হাত দেয়া যায় না। অথচ এর চারটা খরগোশের মত লম্বা লম্বা কান। মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফেল। আর বাবা-মা'কে ঝেং-এর বাচ্চা সম্বন্ধে কিচ্ছু বলবি না। আমার মনে হয় বললে বকা খাবি। আমি টেলিফোন রাখলাম।

ছোট ফুপু খট করে টেলিফোন রেখে দিল। টুকুন মন খারাপ করে নিজের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল, তার বিছানার উপরে একগাদা ছেঁড়া কাগজের একটিও নেই। নিশ্চয়ই ঝেং-এর বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে।

টুকুন আবার ছুটে গেল টেলিফোন করতে।

'হ্যালো ছোট ফুপু।'

'আবার কি হল?'

'ঝেং-এর বাচ্চা কি করেছে জান?'

অপলা গম্ভীর গলায় বলল, ঝেং-এর বাচ্চা সম্পর্কে কোন কথা শুনতে চাই

না। অন্য কিছু বলার থাকলে বল। আছে কিছু বলার?

'না।'

'বেশ, তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখ। আর আমাকে ডিসটার্ব করবি না। মনে থাকে যেন। আমার কিচ্ছু পড়া হয়নি। নির্ঘাৎ থার্ড ক্লাস পাব। তুই কি চাস আমি থার্ড ক্লাস পাই?'

'না চাই না।'

'তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখ। এবং মন দিয়ে আমার কথাটা শোন। কথাটা হচ্ছে — আবার টেলিফোন করবে না।'

'আচ্ছা।'

'খোদা হাফেজ টুকুন।'

'খোদা হাফেজ ছোট ফুপু।'

টুকুন টেলিফোন নামিয়ে রাখল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার টেলিফোন করল। সে জানে ছোট ফুপু খুব রাগ করবে তবুও টেলিফোন করল, কারণ আসল কথাই বলা হয়নি। ঝেং-এর বাচ্চা কাগজ খেয়ে ফেলেছে — এটাই বলা হয়নি।

'হ্যালো ছোট ফুপু।'

'হুঁ।'

'আবার ফোন করেছি বলে রাগ করেছ?'

'করেছি। প্রচণ্ড রাগ করেছি।'

'আমি শুধু একটা কথা বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখব।'

'বেশ বল একটা কথা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কাগজ খেয়ে ফেলেছে।'

'কি খেয়ে ফেলেছে?'

'কাগজ। আমার বিছানার উপর অনেক কাগজ ছিঁড়ে রেখেছিলাম। ঐগুলি খেয়ে ফেলেছে। এখন কোন কাগজ নেই।'

'শোন টুকুন — ঝেং-এর বাচ্চা কোন কাগজ খায়নি। রহিমা বুয়া ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর।'

'আচ্ছা করছি।'

টুকুন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না, কারণ কলিংবেল বাজছে। তার বাবা-মা চলে এসেছেন। টুকুন দৌড়ে গেল সদর দরজার দিকে।

রশিদ সাহেব মেয়েকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে একটা কেক কিনে

এনেছেন। শুধু কেক না, আটটা মোমবাতিও আছে।

রাতের খাবার শেষ হবার পর মোমবাতি জ্বালানো হল। মা বললেন, চোখ বন্ধ করে মনে মনে কিছু চাও এবং মোমবাতি ফু দিয়ে নেভাও। এক ফু দিয়ে নেভাও। এক ফু দিয়ে নেভাতে পারলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

টুকুন চোখ বন্ধ করে এক ফু দিল এবং মনে মনে বলল, আমি যেন ঝেং-এর বাচ্চাকে দেখতে পাই। চোখ মেলে দেখল সব মোমবাতি নিভে গেছে। তারচেয়েও বড় কথা — সে ঝেং-এর বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছে। শরীরটা মনে হচ্ছে নরম কাঁচের তৈরি। চোখ দু'টি হালকা গোলাপী। চারটা লম্বা কান বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে।

টুকুন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, ঝেং-এর বাচ্চা! ঝেং-এর বাচ্চা! ঐ দেখ ঝেং-এর বাচ্চা! আমি দেখতে পাচ্ছি!

রশিদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, কি বলছ টুকুন?

টুকুন বলল, একটা ঝেং-এর বাচ্চা বসে আছে বাবা। কান নাড়ছে। দেখ দেখ, কি সুন্দর করে কান নাড়ছে।

'কিসের বাচ্চা বললে?'

'ঝেং-এর বাচ্চা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা ব্যাপারটা কি?'

'একটা অদৃশ্য প্রাণী। এই প্রাণীটা কেউ চোখে দেখতে পারে না। এর চারটা লম্বা লম্বা কান আছে। ও চেয়ারটায় বসে আছে বাবা।'

'তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি।'

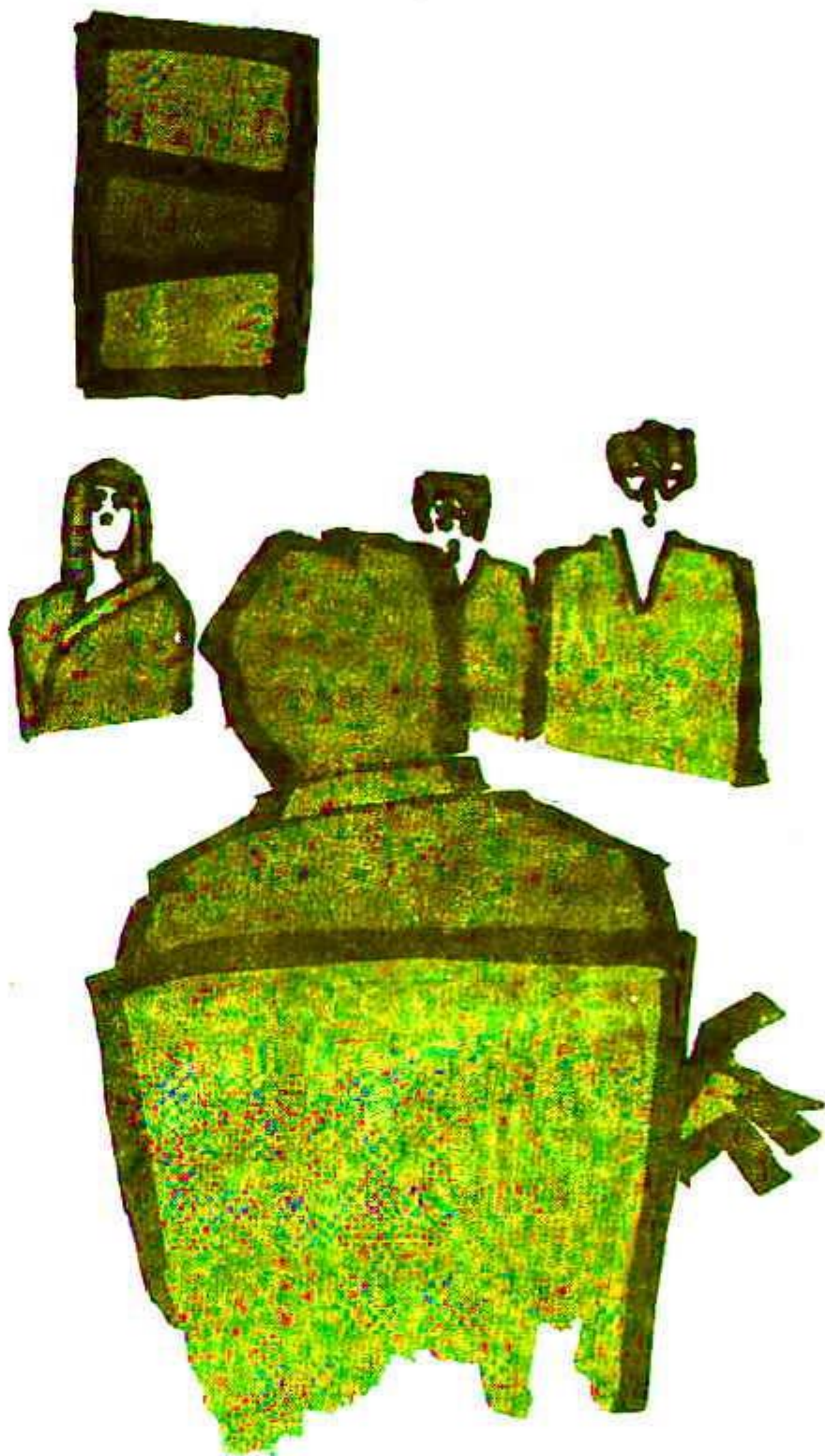
রশিদ সাহেব অনেকক্ষণ মন খারাপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুনাকে বললেন, এতদিন ছিল কাক। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে — ঝেং-এর বাচ্চা। কি করি বল তো?

মুনা টুকুনের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, কোথায় তোর ঝেং-এর বাচ্চা?

'ঐ তো বসে আছে।'

'যা ধরে নিয়ে আয়।'

টুকুন ঝেং-এর বাচ্চা ধরতে গেল। বাচ্চা পালিয়ে গেল না। বরং হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে হাতে উঠে এল। টুকুন ঝেং-এর বাচ্চা কোলে নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার বাবা-মা, দু'জনই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। কারণ তাঁরা কিছুই দেখছেন না।



ডাক্তার সাহেব বললেন, কি হয়েছে ওর?

৫

....

টুকুনের বাবা-মা টুকুনকে একজন শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোকের নাম এম. আলম। শিশু হাসপাতালের খুব বড় ডাক্তার। গম্ভীর চেহারা হলে ও — তাঁকে দেখে মনে হয় — তিনি মজার মজার গল্প জানেন।

টুকুনের বাবা বললেন, আমার এই ছেলেটাকে ভাল করে একটু দেখুন তো ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কি হয়েছে ওর?

'ওর মাথায় কোন সমস্যা হয়েছে কি-না সেটা দেখুন।'

'মাথায় সমস্যার কথা কেন বলছেন? কি খোকা, তোমার মাথা ব্যথা করে?

টুকুন বলল, না।

'তাহলে সমস্যা কি তোমার? পড়া মনে থাকে না?'

'পড়া মনে থাকে।'

মুনা বললেন, ওর বাইরে থেকে কোন সমস্যা নেই ডাক্তার সাহেব। পড়াশোনায় ভাল। বুদ্ধিমান। প্রচুর খেলাধুলা করে। হঠ্যাৎ একদিন বলা শুরু করল — একটা কাক নাকি তার সঙ্গে কথা বলে।

মুনাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই ডাক্তার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এই সামান্য কারণে তাকে আপনি আমার কাছে নিয়ে এসেছেন? আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার পরিস্কার মনে আছে — আমি একটা টেডি বিয়ারের সঙ্গে কথা বলতাম। এটা কোন ব্যাপারই না।

রশিদ সাহেব বললেন, আমি জানি এটা কোন ব্যাপার না। আমি বা আমার স্ত্রী — আমরা কেউ তেমন গুরুত্ব দেইনি কিন্তু ইদানিং নতুন সমস্যা হয়েছে। সে বলছে তার সঙ্গে একটা ঝেং-এর বাচ্চা থাকে।

'কিসের বাচ্চা?'

'ঝেং-এর বাচ্চা। একটি অদৃশ্য প্রাণী। যাকে কেউ দেখতে পায় না। শুধু সে

দেখতে পায়।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, বলুক না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কি আছে? বাচ্চাদের অনেক ধরনের ফ্যান্টাসি থাকে। একটু বুদ্ধি হলেই সব কেটে যাবে। আপনাদের চিন্তিত বোধ করার কোনই কারণ নেই।

রশিদ সাহেব বললেন, চিন্তিত বোধ করার কারণ একেবারেই যে নেই তা না। ও এখন সারাক্ষণই আছে তার ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে। তাকে গোসল করাচ্ছে। গা মুছে দিচ্ছে। স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নেয়ার উপায় এখন আর নেই। এই যে আপনার কাছে এসেছি — আমার ছেলে তার ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার সাহেব হাসিমুখে বললেন, তাই নাকি খোকা?

টুকুন বলল, হ্যাঁ।

'কোথায় সে?'

'ঐ তো, আপনার টেবিলে বসে আছে।'

ডাক্তার সাহেব টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শূন্য টেবিল মনে হল তিনি খানিকটা হতাশ হয়েছেন। হয়ত আশা করেছিলেন কিছু দেখবেন। ডাক্তার সাহেব টুকুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ঝেং-এর বাচ্চা কি খায়?

'কাগজ খায়।'

'সব ধরনের কাগজ খায়?'

'জ্বি না। খবরের কাগজ খায় না।'

'টাকা খায়? টাকাও তো কাগজে ছাপা।'

'খেতে পারে। আমি কখনো ওকে টাকা খেতে দেইনি।

'আচ্ছা, এই চকচকে নোটটা রাখলাম। দেখি ও খায় কি-না।'

ডাক্তার সাহেব একটা পাঁচশ টাকার নোট টেবিলে রাখলেন।

টুকুন বলল, আপনার সামনে তো খাবে না। কেউ সামনে থাকলে খায় না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, তুমি আদর করে বল, তুমি আদর করে বললে হয়ত খাবে।

টুকুন বলল, খাও তো টুন টুন, খাও তো।

পাঁচশ' টাকার নোট পড়ে রইল। টুকুন বলল, ও খাবে না। আমরা তাকিয়ে আছি তো — এই জন্যে খাবে না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, ও তাহলে টাকা খাবে না?

টুকুন বলল, আমরা সবাই তাকিয়ে আছি তো তাই খাবে না। তাকিয়ে না

থাকলে হয়ত খেয়ে ফেলত। ও খুব লাজুক।

'ওর স্বভাব-চরিত্র কি বল দেখি?'

'শান্ত স্বভাব। খুব ভদ্র।'

'দাঁত আছে?'

'আছে। আমাদের যেমন সাদা দাঁত ওরগুলি তেমন নয়। ওরগুলি হালকা নীল।'

'দাঁত মেজে দিতে হয়?'

'আমি মাঝে মাঝে আমার টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে দেই।'

মুনা বললেন, ডাক্তার সাহেব, এখন আপনি বলুন — আমরা যখন দেখি একটা ছেলে অদৃশ্য এক প্রাণীর দাঁত মেজে দিচ্ছে তখন কেমন লাগে?

ডাক্তার সাহেব মুনার কথার জবাব না দিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার পাঁচশ' টাকার নোটটা কোথায় গেল?

'তাই তো। টেবিলে ফেলে রাখা পাঁচশ' টাকার নোটটা নেই।'

টুকুন বলল, আমার মনে হয় ঝেং-এর বাচ্চা নোটটা খেয়ে ফেলেছে। আমরা যখন অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম তখন সে এক ফাঁকে কপ করে খেয়ে ফেলেছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, শোন খোকা, কেউ কিছু খায়নি। বাতাসে নোটটা টেবিল থেকে নিচে পড়ে গেছে। এক্ষুণি তা খুঁজে বের করা হবে।

ডাক্তার সাহেব ব্যস্ত হয়ে টেবিলের নিচে খুঁজতে লাগলেন। ময়লা ফেলার ঝুড়ির সব কাগজ মেঝেতে ঢেলে ফেলা হল। টুকুনের বাবা-মাও খুঁজতে লাগলেন। টুকুনও খুঁজছে। নোট নেই। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, বাতাসে হয়ত জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। এই হয়েছে। এছাড়া আর কিছু না। তিনি তাঁর এ্যাসিসটেন্টকে বাইরে খুঁজতে পাঠালেন। কিছু পাওয়া গেল না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, বুঝতে পেরেছি কি হয়েছে — নোটটা জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। কেউ একজন খুঁজে পেয়ে নিয়ে গেছে। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। রশিদ সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, আমি আপনাকে টাকাটা দিয়ে দি।

'আরে না, আপনি কেন টাকা দেবেন! ভাল কথা, এই অদৃশ্য জন্তুর অস্তিত্বে আপনারা কি বিশ্বাস করেন?'

'জ্বি-না।'

'এমন কিছু কি ঘটেছে যাতে এই জন্তুটিকে বিশ্বাস করতে হয়?'

'না, এমন কিছু ঘটে নি।'

'তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। এই ছেলে কি ভাবছে না ভাবছে এটা বড় কথা নয়। আমার মনে হয় আপনার ছেলে এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর 'ইনভিজিবল ম্যান' বইটা পড়েছে। পড়ার পর তার মাথায় অদৃশ্য জন্তুর ধারণা ঢুকে গেছে। আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না। তাহলেই হল।'

'আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি না।'

'দিচ্ছেন না তাও কিন্তু না। প্রশ্রয় দিচ্ছেন — এই যে ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছেন, এও এক ধরনের প্রশ্রয় দেয়া।'

ডাক্তার সাহেব টুকুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকা তুমি কি অদৃশ্য মানব বইটা পড়েছ?

টুকুন গম্ভীর গলায় বলল, মানুষ অদৃশ্য হতে পারে না। অদৃশ্য হয় ঝেং এর বাচ্চা।

ডাক্তার সাহেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

রশিদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। টুকুনকে বললেন, উনাকে স্লামালিকুম দাও।

টুকুন বলল, স্লামালিকুম।

ডাক্তার সাহেব বললেন, খোকা, তুমি কি তোমার ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছ?

'জ্বি, নিয়ে যাচ্ছি।'

'গুড।'

তাঁরা চলে যাবার পর ডাক্তার সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হল, কারণ টেবিলে রাখা তাঁর ডায়েরীর অর্ধেকের মত পাতা নেই। মনে হচ্ছে এইমাত্র ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। অথচ এই ডায়েরীটা তাঁর খুবই দরকারী। জরুরী ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার লেখা। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

৬

অপালার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। খুব ভাল পরীক্ষা হওয়ায় তার মন ভাল। সে পরীক্ষার পরদিনই একটা ক্যামেরা নিয়ে টুকুনদের বাসায় উপস্থিত। এখন সে টুকুনের বিখ্যাত ঝেং-এর ছানা নিয়ে গবেষণা করবে। ক্যামেরা এনেছে। ঝেং-এর বাচ্চার ছবি তুলে, ছবি প্রিন্ট করবে। যদি ছবিতে কিছু আসে। বেশকিছু ছবি তোলা হল। সিঙ্গেল ছবি, টুকুনের কোলে বসিয়ে ছবি। ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে, ফ্ল্যাশ লাইট ছাড়া।

টুকুন বলল, ছবিতে কি ওকে দেখা যাবে ছোট ফুপু?

অপলা বলল, না দেখা যাবে না। যে জিনিস চোখে দেখা যায় না সে জিনিস ক্যামেরাতেও ধরা পড়ে না।

'তাহলে ছবি তুলছ কেন?'

'এম্নি তুলছি।'

অপলা শুধু যে ছবি তুলল তাই না, আরো কিছু কাণ্ড করল। ওজন মাপার যন্ত্রে জন্তুটার ওজন নেয়ার চেষ্টা করল। না এর কোন ওজন নেই।

অপলা বলল, এখন তোর ঝেং-এর বাচ্চাকে আমরা চৌবাচ্চার পানিতে চুবিয়ে ধরে রাখব।

'তাতে কি হবে?'

'দেখব বেঁচে থাকার জন্যে এর অক্সিজেনের দরকার আছে কি-না। ধর, এটাকে নিয়ে আয়, আমরা চৌবাচ্চার পানিতে চুবাব।'

'না, এর কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হলে ছটফট করবে। তখন ছেড়ে দিস। তোর হাতেই তো থাকবে।'

ঝেং এর বাচ্চাকে চৌবাচ্চার পানিতে চুবানো হল। কিছু হল না। অপলা বলল, আচ্ছা, তোর এই জন্তুটার উপর আমি যদি বসে পড়ি তাহলে ওর কি হয়?

'কিছুই হয় না। চ্যাপ্টা হয়ে যায়। তুমি উঠে দাঁড়ালে আবার ঠিক হয়ে যায়।'

'চল এটাকে কোন একটা ক্লিনিকে নিয়ে যাই। এক্সরে করাব। এক্সরে করে



অপলা বলল, এখন তোর ঝেং এর বাচ্চাকে আমরা পানিতে চুবিয়ে রাখব।

দেখব কি ব্যাপার।'

তাও করা হল। অপলা নানান পরীক্ষার পর একটি রিপোর্ট লিখল। সেই রিপোর্ট টাইপ করে টুকুনের হাতে দিয়ে বলল, নে গাধা, বাংলায় লিখে এনেছি। যাকে বলে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন। বসে বসে পড়, তারপর মাথা থেকে ঝেং-এর বাচ্চা দূর কর। তুই সবাইকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছিস। আর না।

অপলা যা লিখে এনেছে তা হল —

ঝেং-এর বাচ্চা
একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন

নাম	ঃ	ঝেং-এর বাচ্চা।
প্রজাতি	ঃ	অজানা। (টুকুনের ধারণা — এটি চার কানের অদৃশ্য জন্তু)
ওজন	ঃ	শূন্য।
দৈর্ঘ ও উচ্চতা	ঃ	শূন্য।
বর্ণ ও গন্ধ	ঃ	নাই।
খাদ্য	ঃ	খাদ্য গ্রহণ করে না। (টুকুনের ধারণা — কাগজ খায় যদিও তা প্রমাণ করা যায়নি।)
ফটোগ্রাফি **এবং এক্সরে পরীক্ষা**	ঃ	কিছু পাওয়া যায়নি।
অক্সিজেন গ্রহণ	ঃ	তথাকথিত জন্তুটি অক্সিজেন গ্রহণ করে না। পানির নিচে, এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ বাক্সে জন্তুটিকে দীর্ঘ সময় রেখে দেখা গেছে সে ভালই আছে।
ঘাত সহনশীলতা	ঃ	প্রচণ্ড চাপেও জন্তুটির কিছু হয় না। জন্তুটি স্থিতিস্থাপক। টানলে রবারের মত বাড়ে [টুকুনের বক্তব্য। কারণ আমরা কেউ তা দেখতে পাচ্ছি না।]
রাসায়নিক সক্রিয়তা	ঃ	বস্তুটি রাসায়নিকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। পানি, তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষার তার কিছুই করে না।
বস্তু ভেদ্যতা	ঃ	জন্তুটি যে কোন বস্তুর ভেতর দিয়ে যেতে পারে। একে টিনের ট্রাংকের ভেতরে বন্ধ করে রাখলেও এ ট্রাংকের

ভেতর দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। সিমেন্টের দেয়ালের ভেতর দিয়ে পারাপার করতে পারে (টুকুনের ধারণা)।

গবেষকের পরীক্ষার ফলাফল ঃ পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিবেচনা করে গবেষক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অদৃশ্য জন্তু জনৈক কিশোরের কষ্ট-কল্পনা। এই কল্পনাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। কিশোরকে বলা হচ্ছে সে যেন তার এই অদৃশ্য জন্তু, তথাকথিত ঝেং-এর বাচ্চাকে অনতিবিলম্বে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসে। তার নিজের এবং পরিবারের শান্তির জন্যে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

টুকুন মুখ কালো করে প্রতিবেদন পড়ল। অপলা হাই তুলে বলল, পড়েছিস?

'হুঁ।'

'তোকে তিন দিন সময় দেয়া হল। তিন দিনের ভেতর এই যন্ত্রণার মুক্তি চাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যা পাওয়া গেল, তোকে বললাম।'

'আচ্ছা।'

'মুখ হাড়ির মত করে রেখেছিস কেন? মুখ হাড়ির মত করে রাখার কিছু নেই।'

অপলা শিস দিতে দিতে চলে গেল। মন খারাপ করে নিজের ঘরে টুকুন চুপচাপ বসে রইল। ঝেং-এর বাচ্চাকে নিয়ে আজ আর খেলতেও ইচ্ছা করছে না। শুধুই কাঁদতে ইচ্ছা করছে। মৃদুলা যদি একটু বড় হত তাহলে তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটত। সে এখনো এত ছোট। সে এখন শুধু দাঁড়াতে শিখেছে, অল্প অল্প হাঁটাও শিখেছে। কথা বলা ঠিকমত শেখেনি। কাগজ ছেঁড়া ছাড়া অন্য কিছু এখনো ভালমত পারে না। সে কাগজ ছেঁড়ে। ঝেং-এর বাচ্চা তার কোলে বসে থাকে। কোলে বসে বসেই খায়। টুকুনের ধারণা — মৃদুলা ঝেং-এর বাচ্চাকে দেখতে পায়। সে কথা বলতে পারে না বলে ঘটনাটা অন্যদের বলতে পারে না।

৭

....

আজ ছুটির দিন। ছুটির দিন দুপুরে টুকুন কখনো ঘুমায় না। আজ তার এতই মন খারাপ যে চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল — ঘুম ভাঙল দাঁড়কাকের ডাকে —

'ও টুকুন! টুকুন! অসময়ে ঘুমুচ্ছ? ব্যাপারটা কি ? দুপুরে কেউ ঘুমায়?'

টুকুন উঠে বসল। কাক একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করল,

'ব্যাপার কি?

মন খারাপ কেন?

কাঁদছিলে না-কি?

হয়েছে কি?'

টুকুন বলল, ছোট ফুপু রিসার্চ করে বের করেছেন ঝেং-এর বাচ্চা বলে কিছু নেই।

'রিসার্চ করে বের করে ফেলেছে?'

'হুঁ।'

'কি বলল সে?'

'বলল, এমন কিছু থাকতে পারে না যে শুধু কাগজ খায় — আর কিছু খায় না।'

'এই কথা বলল?'

'হুঁ।'

'শোন টুকুন, ঝেং-এর বাচ্চা আছে। প্রতিটি সরকারি অফিসে একটা-দু'টা করে ঝেং-এর বাচ্চা আছে। এরা কি করে জান? এরা দরকারী ফাইল খেয়ে ফেলে। প্রায়ই শোন না ফাইল পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় না কেন? ঝেং-এর বাচ্চারা খেয়ে ফেলে। এরা বেঁচেই আছে সরকারি ফাইল খেয়ে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।

'দলিলপত্রের রেকর্ড যেখানে থাকে সেখানেও ঝেং-এর বাচ্চারা থাকে। তারা মহানন্দে রেকর্ডপত্র খেয়ে ফেলে।'

'কেউ কিছু বলে না?'

'না, বরং খুশি হয়।'

'ছোট ফুপুর রিসার্চ তাহলে ঠিক না?'

'উহুঁ।'

'একটা কাগজে উনি প্রতিবেদন লিখেছেন। আপনি একটু পড়ে দেখবেন?'

'প্রতিবেদন-ফেদন পড়তে ভাল লাগে না। চোখেও ডিসটার্ব করছে। তুমি পড়। আমি শুনি।'

টুকুন পড়ে শোনাল। দাঁড়কাক গম্ভীর ভঙ্গিতে শুনল। পড়া শেষ হলে বলল, বোগাস। রিসার্চ কিছুই হয়নি। তোমার ছোট ফুপুর মাথা মোটা।

'উনার মাথা মোটেই মোটা না। গত বছর ফিজিক্স অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন।'

'এইটাই তো মাথামোটার লক্ষণ। মাথামোটারা পড়ার বই ছাড়া কিছু বুঝে না — শুধু বই পড়ে আর ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। ঐ যে তোমাদের রবীন্দ্রনাথের কথাই ধর। কাক নিয়ে যিনি এত সুন্দর একটা কবিতা লিখলেন —

'বৈশাখ মাসে কাক গাছে বসে থাকে।'

তিনি কি কখনো ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়েছেন? হননি। তুমি তোমার ছোট ফুপুকে বলবে — ফুপু, আপনার মাথা মোটা।'

'এটা বলা যাবে না। শুনলে উনি খুব রাগ করবেন।'

'রাগ করলেও বলা উচিত। সত্য গোপন করতে নেই। কি অদ্ভুত মাথামোটা মেয়ে — চোখে দেখা যাচ্ছে না। কাজেই বলে দিল জিনিস নেই। অনেক কিছুই আছে কিন্তু চোখে দেখা যায় না — যেমন ধর তোমার ইলেকট্রন প্রোটন। এদের ওজন আছে, কিন্তু ওজন খুব কম। সাধারণ পাল্লাপাথরে মাপা যায় না। সে ঝেং-এর বাচ্চার ওজন মাপার জন্যে সাধারণ একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এসেছে — কি রকম মাথামোটা মেয়ে — উফ! যাও তো টুকুন — টেলিফোন করে আমার কথাগুলি বলে আস।'

টুকুন টেলিফোন করতে উঠে গেল।

'হ্যালো ছোট ফুপু!'

'কে টুকুন?'

'কাকটা এসেছিল।'

'ও আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম ঝেং-এর বাচ্চা পাওয়ার পর কাক বাবাজী দূর হয়েছেন। উনি তাহলে দূর হননি?'

'না।'

'ভাল কথা। উনি কি বললেন?'

'উনি বললেন — তোমার মাথা মোটা।'

'আমার মাথা মোটা?'

'হ্যাঁ?'

'আর উনার মাথা খুব সরু?'

'ছোটফুপা উনার নিজের মাথার কথা কিছু বলেন নি। তোমারটার কথা বলেছেন।'

'কেন আমার মাথা মোটা সেটা বলেনি?'

'বলেছেন। উনি বলেছেন চোখে না দেখা গেলেই যে একটা জিনিস থাকবে না, তা না। ইলেকট্রন দেখা যায় না। কিন্তু ইলেকট্রন আছে।'

'অবশ্যই আছে। কিন্তু গাধা — ইলেকট্রন দেখা না গেলেও ইলেকট্রনের কাজকর্ম দেখা যায়। তারে হাত দিলে শক খেতে হয়। শক খায় ইলেকট্রনের জন্যে। তোর ঝেং-এর বাচ্চা কিছু করে না। কাউকে শক দেয় না। এমন যদি হত ঘরের সব কাগজপত্র খেয়ে ফেলতো তাহলেও বুঝতাম।'

'তুমি এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন ছোট ফুপু?'

'রেগে রেগে কথা বলছি — কারণ আমি রেগে গেছি। তুই তোর ঐ কাকটাকে বলিস — ছোট ফুপু বলেছেন — আপনি একটা গাধা। বলতে পারবি না?'

'না।'

'না কেন?'

'কারণ উনি গাধা না। পাখি কখনো গাধা হয় না। ছোট ফুপু, তোমার মাথা আসলেই মোটা।'

টুকুন শুনল ছোট ফুপু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। টুকুন ভয়ে ভয়ে বলল, কি হয়েছে ছোট ফুপু?

'কিছু হয়নি।'

'তুমি কাঁদছ?'

'হ্যাঁ, আমি কাঁদছি। চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে আমার। কেউ আমাকে মাথামোটা বলেনি। তুই বলেছিস। আমি কাঁদব না?'

'আমি বলিনি ছোট ফুপু। কাক বলেছে।'

'কাক-টাক সব বাজে কথা। এগুলি তোর মনের কথা।' —

ছোট ফুপু টেলিফোনেই বাচ্চা মেয়েদের মত কাঁদতে লাগলেন। টুকুনের খুব মন খারাপ হল। এরকম কাণ্ড হবে সে কখনো ভাবেনি। তার নিজেরো কান্না পেতে লাগল। ছোট ফুপুকে সে যে কি ভালবাসে তা শুধু সে-ই জানে। আর কেউ জানে না।

৮

ঝেং-এর বাচ্চাটা বোধহয় টুকুনের অবস্থা বুঝতে পারে। আজ যে টুকুন মন খারাপ করেছে মনে হচ্ছে সে বুঝতে পারছে। কারণ সে ঘুরছে টুকুনের পায়ে পায়ে। টুকুন বিছনায় এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সেও বিছানায় এসে টুকুনের পাশে বসে রইল। তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। টুকুন বলল,

'আজ আমার খুব মন খারাপ।'

ঝেং-এর বাচ্চা কান নাড়ল। যেন সে বুঝতে পারছে।

'অনেকগুলি কারণে মন খারাপ। প্রথম কারণ — আমার জন্যে ছোট ফুপু আজ কেঁদেছেন। আর দ্বিতীয় কারণ, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। বাবার ধারণা, আমি পাগল হয়ে গেছি। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়েছি?'

ঝেং-এর বাচ্চা উত্তর দিল না। কান নাড়ল। কান নেড়ে বুঝিয়ে দিল — 'না'।

'কি করি বল তো?'

ঝেং-এর বাচ্চা কিছু বলল না। টুকুন কেঁদে ফেলল। এম্নিতে সে কাঁদে না। বড় হয়েছে তো। বড় হলে কাঁদতে নেই। ঝেং-এর বাচ্চা টুকুনকে কাঁদতে দেখে বিছানা থেকে নেমে গেল। রবারের বলের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মেঝেতে। পড়েই বলের মত কয়েকবার উঠানামা করে গড়াতে গড়াতে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টুকুন দেখল বালিশের কাছে তার রঙের বাক্স পড়ে আছে। আশ্চর্য কাণ্ড তো! রঙের বাক্সটা বাবা ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। ঝেং নিশ্চয়ই নিয়ে এসেছে। সে কি তালা না খুলেই নিয়ে এসেছে?

টুকুনের মন একটু একটু ভাল হতে শুরু করেছে। রঙ দিয়ে দেয়ালে সুন্দর একটা ছবি আঁকলে মনটা হয়তো পুরোপুরি ভাল হয়ে যাবে। ঝেং-এর বাচ্চার একটা বড় ছবি। কেউ যদি দেখতে চায় তাহলে — ছবি দেখালেই হবে।

সন্ধ্যার মধ্যে টুকুন সারা দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড একটা ছবি আঁকল। কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে ঝেং-এর বাচ্চাটাকে! গোলাপী চোখ, নীল দাঁত। লম্বা লম্বা কান।

সন্ধ্যার পর রশিদ সাহেব ছেলের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেয়ালে আঁকা ছবি দেখলেন। শান্ত গলায় বললেন, ছবি তুমি এঁকেছ টুকুন?

'জ্বি বাবা। সুন্দর হয়েছে না?'

'হ্যাঁ, ছবি সুন্দর হয়েছে। এটাই কি তোমার সেই বিখ্যাত ঝেং-এর বাচ্চা?'

'জ্বি।'

'তুমি কি ড্রয়ারের তালা খুলে তোমার রঙ-তুলির বাক্স বের করেছ?'

'না বাবা। ঝেং-এর বাচ্চা এনে দিয়েছে।'

রশিদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ঝেং-এর বাচ্চা এনে দেয়নি। তুমি নিজেই এনেছ। টেবিলের উপর চাবি ছিল। চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে এনেছ। তুমি একসঙ্গে অনেকগুলি অপরাধ করেছ। প্রথম অপরাধ — আমার ড্রয়ার খুলেছ। দ্বিতীয় অপরাধ — দেয়ালে ছবি এঁকেছ। তৃতীয় অপরাধ — মিথ্যা কথা বলেছ। চতুর্থ অপরাধ — তোমার ছোট ফুপুকে মাথামোটা বলেছ।

'আমি বলিনি বাবা। কাক বলেছে।'

'কাক কিছু বলেনি টুকুন। কাক কিছু বলতে পারে না। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলেছ, দোষটা দিচ্ছ কাককে। আমি বাচ্চাদের শাস্তি দিতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমাকে শাস্তি দেয়া দরকার। কি শাস্তি দেয়া যায় বল তো?'

'আমি জানি না বাবা।'

'কি তুমি সবচে' ভয় পাও?'

'বাথরুমে আটকা পড়ে গেলে আমি খুব ভয় পাই।'

'বেশ, তাহলে তাই করা হবে। তোমাকে বাথরুমে আটকে রাখা হবে। যতক্ষণ না তুমি সব অপরাধ স্বীকার কর ততক্ষণ বাথরুমে বন্দি থাকবে।'

টুকুনের কান্না এসে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে কান্না আটকে বলল, কখন আটকাবে বাথরুমে?

'এইত এখন। এসো আমার সঙ্গে?'

'বাতি কি নিভিয়ে দেবে, না বাতি জ্বালানো থাকবে?'

'বাতি নেভানো থাকবে।'

টুকুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ছোটদের এরকম শাস্তি দেয়া কি উচিত?

'না, উচিত নয়। কিন্তু ছোটদেরও এ জাতীয় অপরাধ করা উচিত নয় — সে কারণেই শাস্তি। অপরাধ করলে শাস্তি হয়। অপরাধীর কোন বড় ছোট নেই। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

তিনি ছেলেকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন

বাতি নেভাবেন না। বাথরুম অন্ধকার হলে শাস্তি বেশি হয়ে যাবে। শেষে ঠিক করলেন, নেভাবেন। কিছুটা ভয় টুকুনের পাওয়া দরকার।

রশিদ সাহেব চিন্তিত মুখে তাঁর লেখার টেবিলে গেলেন। ছেলেটাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়া গেছে। কি করা যায় কিছুই বুঝতে পারছেন না। মানসিক অশান্তির কারণে তাঁর নিজের লেখাও এগুচ্ছে না। 'একি কান্ড !' উপন্যাসটা প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছেন — দ্রুত লিখছিলেন। গল্পটা সুন্দর দাঁড়া হয়েছিল। এখন আর এগুচ্ছে না।

লেখার টেবিলে বসে রশিদ সাহেব চমকে উঠলেন। লেখা কাগজগুলি নেই। তিনি টেবিলে খুঁজলেন, মেঝেতে খুঁজলেন। না, কোথাও কিছু নেই। মাঝে মাঝে মৃদুলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে লেখার কাগজ বইয়ের আলমিরায় ঢুকিয়ে রাখেন। বোধহয় তাই করেছেন — তিনি বইয়ের আলমিরা খুললেন। না, লেখার কাগজ নেই। শুধু যে তাই — তা না আলমিরায় বইও নেই। বিরাট আলমিরা, ঠাসা ছিল বই-এ। কালও বইগুলি ছিল। রাতে শোবার সময় বই নিয়ে পড়েছেন। এখন নেই। একটি বইও নেই। কোথায় যাবে এতগুলি বই? ব্যাপারটা কি?

রশিদ সাহেব রান্নাঘরে ঢুকে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, মুনা মুনা।

মুনা এল।

রশিদ সাহেব বললেন, আমাকে এক কাপ চা দাও — আর বাড়িটা একটু ঘুরে ফিরে দেখ তো তুমি কোথাও কোন পরিবর্তন দেখছ কিনা। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে।

মুনা হতভম্ব গলায় বললেন, দেয়ালের ছবিগুলি কোথায়? ছবি?

দেখা গেল — ঘরের দেয়ালে কোন ছবি নেই — ফ্রেম আছে, কিন্তু ছবি নেই। মিনিট পাঁচেক সময়ের মধ্যে তাঁরা আবিস্কার করলেন — ঘরে কোন কাগজ নেই। এক টুকরো কাগজও নেই।

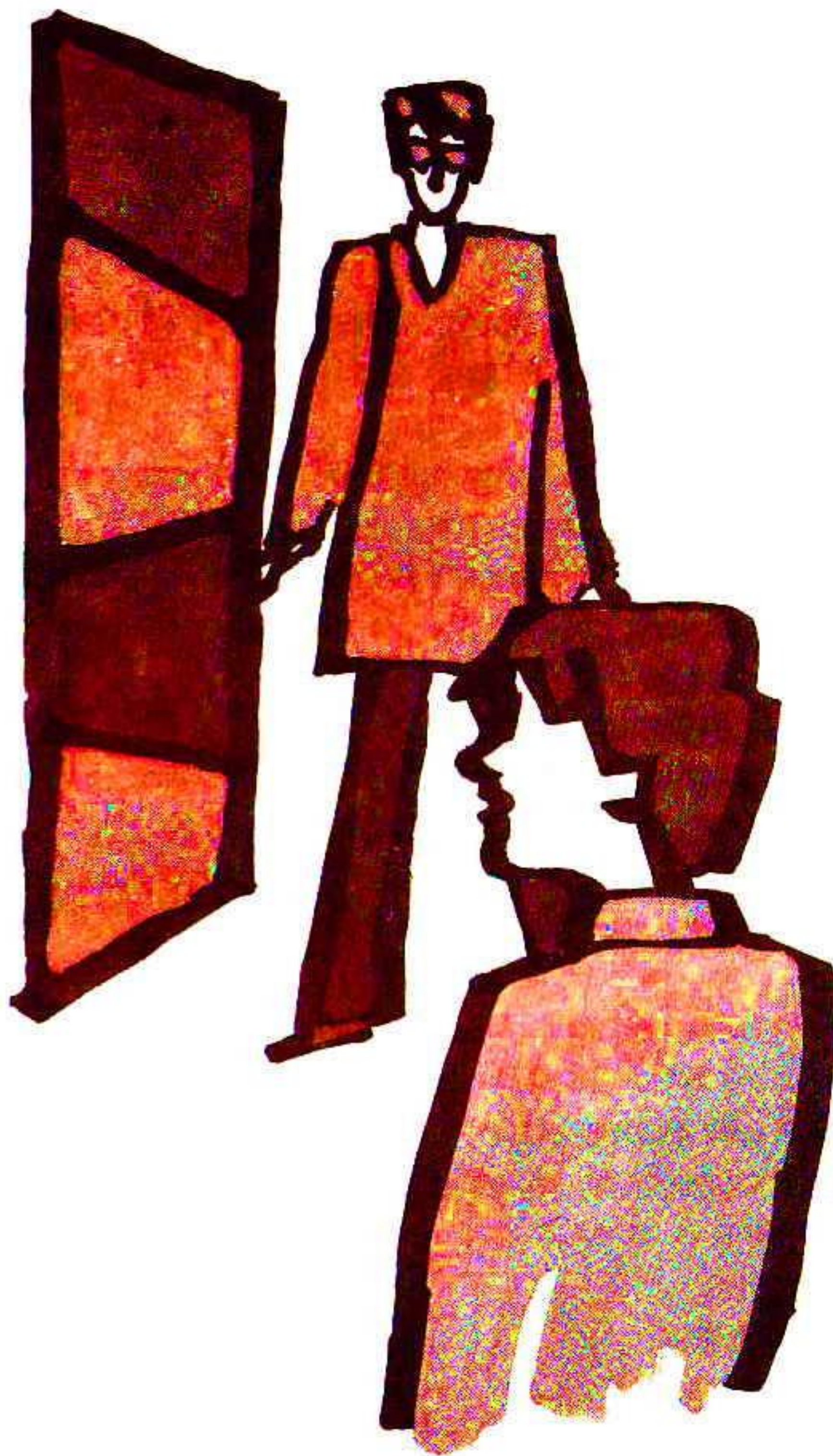
মুনা ছুটে গিয়ে স্টীলের আলমিরা খুললেন। আলমিরার ভেতর সার্টিফিকেট রাখা আছে। জমির দলিল আছে। কিছুই নেই। সংসার খরচের টাকা আলাদা করা ছিল টিনের কৌটায়। তাও নেই। পুরো বাড়ি কাগজ শূন্য।

রশিদ সাহেব বললেন, ব্যাপার কি কিছু বুঝতে পারছ?

মুনা ভীত গলায় বললেন, পারছি।

'তোমার অনুমানটা কি বলতো?'

মুনা ইতস্ততঃ করে বললেন, ঝেং এর বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে।



ছোটদের শাস্তি দেয়া কি উচিত?

'অপলাকে টেলিফোন করে আসতে বল। এক্ষুণি আসতে বল।'

'ও এসে কি করবে?'

'সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে কি করা বা না করা।'

মুনা বললেন, টুকুন কোথায়?

'ওকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।'

'কি শাস্তি?'

'কি শাস্তি তা পরে বলব। এখন তুমি অপলাকে আসতে বল। এক্ষুণি আসতে বল। আমার হাত-পা কাঁপছে। কি সমস্যা বলতো?'

টুকুন একা একা বাথরুমে দাঁড়িয়ে আছে। সে ক্রমাগত কাঁদছে। শার্টের হাতায় চোখ মুছছে। ইচ্ছা করছে চিৎকার করে বলে — বাবা, এতদিন আমি যা বলেছি বানিয়ে বানিয়ে বলেছি। আর বলব না। ঝেং-এর বাচ্চা বলে কিছু নেই। সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। আবার প্রচণ্ড অভিমানও হচ্ছে। কারণ সে জানে যা ঘটছে সবই সত্যি। মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

মিষ্টি করে কে যেন ডাকল টুকুন!

টুকুন ভয়ঙ্কর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে ঝেং-এর বাচ্চা বেসিনের উপর বসে আছে। অন্ধকারেও তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেই কি কথা বলছে? খুব হালকা গলা। ফিস ফিস করে কথা বলছে। এত অস্পষ্ট যে প্রায় বোঝাই যায় না।

'তুমি কথা বলতে পার?'

'হুঁ।'

'তাহলে এতদিন কথা বলনি কেন?'

'কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। খুব কষ্ট হয়।'

'তাহলে এখন কথা বলছ কেন?'

'আমার জন্যে তুমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ এই জন্যেই কথা বলছি। শোন টুকুন, আমি ঠিক করেছি — আমি চলে যাব।'

'কি বললে?'

'আমি চলে যাব।'

'কেন?'

'আমি থাকলেই তোমার নানান সমস্যা হবে। কি দরকার! তোমাকে যখন বাথরুমে দরজা বন্ধ করল তখন এমন রাগ লাগল যে তোমাদের বাসার সব কাগজ

খেয়ে ফেলেছি।'

'সে কি?'

'কাজটা ঠিক হয়নি। ভুল হয়েছে। ঝেং–এর বাচ্চারা কখনো ভুল করে না। আমি রাগের কারণে ভুল করে ফেলেছি — তবে ভুল করলে ভুল শুধরানো যায়। আমি যেসব কাগজ খেয়ে ফেলেছি সব আবার ফেরত দিয়ে যাচ্ছি। যাই টুকুন।'

'আর কিছুক্ষণ থাক। অল্প কিছুক্ষণ।'

'না টুকুন। আমি যাই।'

ঝেং–এর বাচ্চা চলে গেল কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঝেং এর বাচ্চাই কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে।

বাথরুমের দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে।

টুকুন ভয় পেয়ে বলল, কে?

'আমি, আমি দাঁড়কাক। তোমাকে এরা বাথরুমে আটকে রেখেছে শুনে খুবই মন খারাপ হল। তোমাকে সাহস দেবার জন্যে এসেছি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বাথরুমে আটকা পড়েছি আপনাকে কে বলল?'

ঝেং–এর বাচ্চা বলল, ও দেখি কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। শোন টুকুন, আমি ঠিক করেছি আমিও আর তোমার কাছে আসব না। আমার জন্যেও তোমার সমস্যা হচ্ছে। হচ্ছে না?

'হচ্ছে।'

আমার মনে হয়, তোমার বাবাকে তুমি বল যে এতদিন যা বলেছ — সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছ, আর বলবে না। তাহলে তোমার সমস্যা মিটে

'আচ্ছা বলব।'

'মিথ্যা কথা বলা হবে — উপায় কি! মানুষ মিথ্যাটাই সহজে বিশ্বাস করে। মানুষ বড়ই অদ্ভুত জীব।'

বাথরুমের বাতি জ্বলে উঠল।

রশিদ সাহেবের ভয়ার্ত গলা শোনা গেল — টুকুন! টুকুন!

'জ্বি।'

'বেশি ভয়ে পেয়েছিস?'

'না বাবা।'

তিনি বাথরুমের দরজা খুলে টুকুনকে কোলে তুলে নিলেন। বাবার পাশে মা

৭দাঁড়িয়ে আছেন। মা'র পাশে ছোট ফুপু। তাদের পেছনে রহিমার মা। রহিমার মা'র কোলে মৃদুলা। মৃদুলা ঘুমুচ্ছে।

টুকুন ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, এতদিন যা বলেছি সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছি, বাবা। আর কোনদিন বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলব না।

রশিদ সাহেব অবাক হয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মুনা তাকাল অপলার দিকে।

টুকুন ছোট ফুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, ছোট ফুপু! আসলে আমিই তোমাকে মাথামোটা বলেছি। আর কোনদিন বলব না।

টুকুন শব্দ করে কাঁদতে লাগল। অপলা এসে টুকুনকে কোলে নিল। অপালার নিজের চোখেও পানি এসে গেছে। সে ইতস্ততঃ করে বলল, টুকুন, হয়ত তোর কথাই ঠিক। হয়ত ঝেং-এর বাচ্চা বলে একটা কিছু আছে যে কাগজ খায়। হয়ত আমরাই ভুল করেছি।

টুকুন বলল, তোমরা কোন ভুল করনি। সব আমার বানানো।'

তারা সবাই শোবার ঘরে ঢুকল। রশিদ সাহেব দেখলেন — লেখার টেবিলে তাঁর লেখা ঠিকঠাক আছে। আলমিরার বই সব আছে। দেয়ালের ছবিও ফিরে এসেছে — শুধু একটা ছবি উল্টো হয়ে গেছে। মাথাটা নিচের দিকে।

রশিদ সাহেব দীর্ঘ সময় উল্টো হয়ে যাওয়া ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, অনেকদিন ধরে আমরা কোথাও বেড়াতে যাই না। বলতে গেলে ঘরের মধ্যে বন্দি। মনে হচ্ছে এজন্যেই আমাদের সবার মাথা খানিকটা জট পাকিয়ে গেছে — দল বেঁধে সবাই সমুদ্রের কাছে গেলে কেমন হয়?

টুকুন বলল, খুব ভাল হয় বাবা।

টুকুনরা খুব আনন্দ করে সমুদ্রের কাছ থেকে ঘুরে এল।

তারপর কতদিন কেটে গেল। তাদের বাড়িটার কত অদল-বদল হল — শুধু উল্টে-যাওয়া ছবিটা সেই জায়গাতেই রইল। রশিদ সাহেব প্রায়ই এই ছবিটার সামনে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে তিনি কি ভাবেন তা কাউকে বলেন না। কেউ জানতেও চায় না। এই পৃথিবী বড়ই বিচিত্র! এই পৃথিবীর সব রহস্য জানতে চাওয়া ঠিক না।
